সাধারণ তফসীর বিধির তাগিদও তাই। আয়াতের শানে নুযূল বিশেষ ঘটনা ও বিশেষ শ্রেণীর লোক হলেও শব্দের ব্যাপকতা ধর্তব্য হয়ে থাকে। তাই সারা বিশ্বের এবং সর্বকালের মুহাজির আলোচ্য ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত। উভয় ওয়াদা সব মুহাজিরের ক্ষেত্রে পূর্ণ হওয়া একটি নিশ্চিত ও অনিবার্য ব্যাপার।

এমনি ধরনের এক ওয়াদা মুহাজিরদের জন্য সূরা নিসার নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে ঃ

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً

এতে বিশেষ করে বাসস্থানের প্রশস্ততা এবং জীবিকার সচ্ছলতার ওয়াদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোরআন পাক এসব ওয়াদার সাথে মুহাজিরদের কিছু গুণাবলী এবং হিজরতের কিছু শর্তাবলীও বর্ণনা করেছে। তাই এসব ওয়াদার যোগ্য অধিকারী ঐসব মুহাজিরই হতে পারে, যারা এসব গুণের বাহক এবং যারা প্রার্থিত শর্তসমূহ পূর্ণ করে।

তন্মধ্যে সর্বপ্রথম শর্ত হচ্ছে فِي اللّٰهِ—অর্থাৎ হিজরত করার লক্ষ্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন হতে হবে। এতে পার্থিব কাজ-কারবারের মুনাফা, চাকরি এবং প্রবৃত্তিগত উপকারিতা উদ্দেশ্য হতে পারবে না। দ্বিতীয় শর্ত মুহাজিরদের নির্যাতিত হওয়া; যেমন বলা হয়েছে ঃ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا—তৃতীয় গুণ প্রাথমিক কষ্ট ও বিপদাপদে সবর করা ও দৃঢ়পদ থাকা; যেমন বলা হয়েছে ঃ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا

চতুর্থ গুণ যাবতীয় বস্তুনিষ্ঠ কলা-কৌশল অবলম্বন করা সত্ত্বেও ভরসা শুধু আল্লাহ্‌র ওপর রাখা; অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে এরূপ বিশ্বাস রাখা যে, বিজয় ও সাফল্য একমাত্র তাঁরই হাতে; যেমন বলা হয়েছে ঃ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

এ থেকে জানা গেল যে, প্রাথমিক বিপদাপদ ও কষ্ট তো প্রত্যেক কাজে হয়েই থাকে। এগুলো অতিক্রম করার পরও যদি কোন মুহাজির উত্তম ঠিকানা ও উত্তম অবস্থা না পায়, তবে কোরআনের ওয়াদায় সন্দেহ করার পরিবর্তে নিজের নিয়ত, আন্তরিকতা ও কর্মের উৎকর্ষ যাচাই করা দরকার। এগুলোর ভিত্তিতেই এ ওয়াদা করা হয়েছে। যাচাই করার পর সে জানতে পারবে যে, দোষ তার নিজেরই। কোথাও হয়তো নিয়তে ত্রুটি রয়েছে, কোথাও হয়তো সবর, দৃঢ়তা ও ভরসার অভাব আছে।

দেশত্যাগ ও হিজরতের বিভিন্ন প্রকার বিধি-বিধান ঃ ইমাম কুরতুবী এস্থলে হিজরত ও দেশ ত্যাগের প্রকার ও বিধি-বিধান সম্পর্কে একটি উপকারী প্রবন্ধ রচনা করেছেন। পাঠকবর্গের উপকারার্থে নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হল ঃ

কুরতুবী ইবনে আরাবীর বরাত দিয়ে লিখেন ঃ দেশত্যাগ করা এবং দেশ ভ্রমণ

করা কোন সময় কোন বস্তু থেকে পলায়ন ও আত্মরক্ষার্থে হয় এবং কোন সময় কোন বস্তুর অন্বেষণের জন্য হয়। প্রথম প্রকারকে হিজরত বলে। হিজরত ছয় প্রকার ঃ

প্রথম. দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে যাওয়া। এ প্রকার সফর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলেও ফরয ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত শক্তি-সামর্থ্যের শর্তসহ ফরয, যদি দারুল কুফরে জান, মাল ও আবরুর নিরাপত্তা না থাকে কিংবা ধর্মীয় কর্তব্য পালন সম্ভব না হয়। এরপরও যদি কেউ দারুল কুফরে অবস্থান করে, তবে সে গোনাহ্গার হবে।

দ্বিতীয়. বিদ'আতের স্থান থেকে চলে যাওয়া। ইবনে কাসেম বলেন ঃ আমি ইমাম মালেকের মুখে শুনেছি, এমন জায়গায় কোন মুসলমানের বসবাস করা হালাল নয়, যেখানে পূর্ববর্তী মনীষীদেরকে গালিগালাজ করা হয়। এই উক্তি উদ্ধৃত করে ইবনে আরাবী লিখেন ঃ এটা সম্পূর্ণ নির্ভুল। কেননা, যদি তুমি কোন গহিত কাজ বন্ধ করতে না পার, তবে নিজে সেখান থেকে দূরে সরে যাও। এটা তোমার জন্য জরুরী ; যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ

তৃতীয় যেখানে হারামের প্রাধান্য, সেখান থেকে চলে যাওয়া। কেননা হালাল অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।

চতুর্থ. দৈহিক নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার্থে সফর করা। এরূপ সফর জায়েয ; বরং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে রহমত। যেস্থানে শত্রুদের পক্ষ থেকে দৈহিক নির্যাতনের আশংকা থাকে, সেস্থান ত্যাগ করা উচিত ; যাতে আশংকা মুক্ত হওয়া যায়। সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আ) এই প্রকার সফর করেন। তিনি কওমের নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ইরাক থেকে সিরিয়ার উদ্দেশে রওয়ানা হন এবং বলেন ঃ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي তারপর হযরত মূসা (আ) এমনি এক সফর মিসর থেকে মাদইয়ান অভিমুখে করেন। যেমন কোরআন বলে ঃ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ

পঞ্চম. দূষিত আবহাওয়া ও রোগের আশংকা থেকে আত্মরক্ষার্থে সফর করা। ইসলামী শরীয়ত এরও অনুমতি দেয় ; যেমন রসূলুল্লাহ্ (সা) কয়েকজন রাখালকে মদীনার বাইরে বনভূমিতে অবস্থান করার আদেশ দেন। কেননা, শহরের আবহাওয়া তাদের অনুকূলে ছিল না। এমনিভাবে হযরত ওমর ফারূক (রা) আবূ ওবায়দাকে রাজধানী জর্দান থেকে স্থানান্তরিত করে কোন মালভূমিতে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেন, যেখানে আবহাওয়া দূষিত নয়।

কিন্তু এটা তখন, যখন কোন স্থানে প্লেগ অথবা মহামারী ছড়িয়ে না থাকে। যেখানে কোন মহামারী ছড়িয়ে পড়ে, সেখানে নির্দেশ এই যে, পূর্ব থেকে যারা সেখানে

বিদ্যমান রয়েছে, তারা সেখান থেকে পলায়ন করবে না এবং যারা সেই এলাকার বাইরে রয়েছে তারা এলাকার ভিতরে যাবে না। সিরিয়ার সফরে হযরত ওমর (রা) এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি সিরিয়া সীমান্তে পেঁছার পর জানতে পারেন যে, সিরিয়ায় প্লেগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় তিনি সিরিয়ায় প্রবেশ করবেন কিনা এ ব্যাপারে ইতস্তত করতে থাকেন। সাহাবায়ে কিরামের সাথে অবিরাম পরামর্শের পর হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ তাঁকে একটি হাদীস শোনান। হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

اذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها واذا وقع بارض ولستم بها فلا تهبطوا عليها -

যখন কোন ভূখণ্ডে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে এবং তোমরা সেখানে বিদ্যমান থাক, তবে সেখান থেকে বের হয়ো না এবং যেখানে তোমরা পূর্ব থেকে বিদ্যমান না থাক, প্লেগ ছড়িয়ে পড়ার সংবাদ শুনে সেখানে প্রবেশ করো না।---(তিরমিযী)

খলীফা ওমর (রা) তখন হাদীসের নির্দেশ পালন করে সমগ্র কাফেলাকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেন।

কোন কোন আলিম বলেন ঃ হাদীসের এই নির্দেশের একটি বিশেষ রহস্য এই যে, যারা মহামারীর এলাকায় পূর্ব থেকে অবস্থান করছে, তাদের মধ্যে মহামারীর জীবাণু থাকার সম্ভাবনা প্রবল। তারা যদি সেখান থেকে পলায়ন করে, তবে যে ব্যক্তির মধ্যে এই জীবাণু অনুপ্রবেশ করেছে, সে তো মরবেই এবং যেখানে সে যাবে, সেখানকার লোকও তার দ্বারা প্রভাবিত হবে। তাই ইহা হাদীসের বিজ্ঞজনোচিত ফয়সালা।

ষষ্ঠ ধনসম্পদ হিফাযতের জন্য সফর করা। কোন স্থানে চোর-ডাকাতের উপদ্রব দেখলে সেস্থান ত্যাগ করার অনুমতি ইসলামে রয়েছে। কেননা, মুসলমানের ধনসম্পদও তার জানের ন্যায় সম্মানার্হ। এই ছয় প্রকার তো ছিল ঐ দেশ ত্যাগের যা কোন বস্তু থেকে পলায়ন ও আত্মরক্ষার্থে হয় আর শেষোক্ত প্রকার অর্থাৎ কোন বস্তুর অন্বেষণে যে সফর করা হয়, তা নয় ভাগে বিভক্ত।

(১) শিক্ষার সফর অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সৃষ্টজগত, অপার শক্তি ও বিগত জাতি-সমূহের অবস্থা সরেযমীনে পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিশ্ব-পর্যটন করা। কোরআন পাক এরূপ সফরে উৎসাহিত করে বলেছে ঃ

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن

قَبْلِهِمْ ----হযরত যুলকারনাইনের সফরও কোন কোন আলিমের মতে এ ধরনের সফর ছিল। কেউ কেউ বলেন ঃ তাঁর সফর পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র আইন প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে ছিল।

(২) হজ্জের সফর। কতিপয় শর্তসহ এ সফর যে ইসলামী ফরয, তা সুবিদিত।

(৩) জিহাদের সফর। এটাও যে ফরয, ওয়াজিব অথবা মোস্তাহাব, তা সব মুসলমানের জানা রয়েছে।

(৪) জীবিকার অন্বেষণে সফর। স্বদেশে জীবিকার প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংগৃহীত না হলে অন্যত্র সফর করে জীবিকা অন্বেষণ করা অপরিহার্য।

(৫) বাণিজ্যিক সফর অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধনসম্পদ অর্জন করার জন্য সফর করা। শরীয়তে এটাও জায়েয। আল্লাহ্ বলেনঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ —আয়াতে ابتغاء فضل (কৃপা অন্বেষণ) বলে বাণিজ্য বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা হজ্জের সফরেও বাণিজ্যের অনুমতি দান করেছেন। অতএব বাণিজ্যের জন্য সফর করা আরও উত্তম-রূপে বৈধ হবে।

(৬) জ্ঞান অর্জনের জন্য সফর। ধর্ম পালনের জন্য যতটুকু জরুরী, ততটুকু জ্ঞান অর্জনের জন্য সফর করা ফরযে আইন এবং এর বেশির জন্য ফরযে কেফায়া।

(৭) কোন স্থানকে পবিত্র মনে করে সেদিকে সফর করা। তিনটি মসজিদ ব্যতীত এরূপ সফর বৈধ নয়ঃ মসজিদে হারাম (মক্কা), মসজিদে নববী (মদীনা) এবং মসজিদে আকসা (বায়তুল মোকাদ্দাস)। এ হচ্ছে কুরতুবী ও ইবনে আরাবীর অভিমত। অন্যান্য আলিমের মতে সাধারণ পবিত্র স্থানসমূহের দিকে সফর করাও জায়েয। ---(মোঃ শফী)

(৮) ইসলামী সীমান্ত সংরক্ষণের জন্য সফর। একে 'রিবাত' বলা হয়। বহু হাদীসে রিবাতের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত রয়েছে।

(৯) স্বজন ও বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতের জন্য সফর। হাদীসে একেও পুণ্যকাজ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সহীহ্ মুসলিমের হাদীসে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সাক্ষাতের জন্য সফর করে, তার জন্য ফেরেশতাদের দোয়া করার কথা উল্লিখিত রয়েছে। এটা তখন, যখন কোন বৈষয়িক স্বার্থের জন্য নয়; বরং আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তাদের সাথে সাক্ষাত করা হয়। واللہ اعلم

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ
الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ۭ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ
الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝

(৪৩) আপনার পূর্বেও আমি প্রত্যাদেশসহ মানবকেই তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। অতএব জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে; (৪৪) প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে নির্দেশাবলী ও অবতীর্ণ গ্রন্থসহ এবং আপনার কাছে আমি স্মরণিকা অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐ সব বিষয় বিবৃত করেন, যেগুলো তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (অবিশ্বাসীরা আপনার রিসালত ও নবুয়ত এ কারণে স্বীকার করে না যে, আপনি মানব। তাদের মতে রসূল মানব না হওয়া উচিত। এটা তাদের মূর্খতা-প্রসূত ধারণা। কেননা) আমি আপনার পূর্বেও শুধু মানবকেই রসূল করে মু'জিযা ও গ্রন্থাদি দিয়ে প্রেরণ করেছি। আমি তাদের কাছে নির্দেশ প্রেরণ করতাম। অতএব (হে মক্কার অধিবাসীরা) যদি তোমাদের জানা না থাকে, তবে যারা জানে, তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখ (অর্থাৎ এমন লোকদেরকে জিজ্ঞেস কর, যারা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের অবস্থা জানে এবং তোমাদের ধারণা মতেও তারা মুসলমানদের পক্ষপাতিত্ব না করে। এমনিভাবে আপনাকেও রসূল করে) আপনার প্রতিও এ কোরআন নাযিল করেছি, যাতে (আপনার মাধ্যমে) যে হিদায়ত মানুষের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে আপনি সেগুলো স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেন এবং যাতে তারা তাতে চিন্তা-ভাবনা করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মক্কার মুশরিকরা মদীনার ইহুদীদের কাছে তথ্যানুসন্ধানের জন্য দূত প্রেরণ করল। তারা জানতে চাইল যে, বাস্তবিকই পূর্বেও সব পয়গম্বর মানব জাতির মধ্য থেকে প্রেরিত হয়েছেন কি না।

أَهْلَ الذِّكْرِ ---শব্দটি গ্রন্থধারী সম্প্রদায় ও মুসলমান সবাইকে বোঝায়; কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, মুশরিকরা অমুসলমানদের বর্ণনা দ্বারাই তুষ্ট হতে পারত। কারণ তারা স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বর্ণনায় সন্তুষ্ট ছিল না। এমতাবস্থায় মুসলমানদের বর্ণনা তারা কিরূপে মানতে পারত। أَهْلَ الذِّكْرِ—ذكر শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে এক অর্থ জ্ঞান। এ অর্থের সাথে সম্পর্ক রেখে কোরআন পাকে তওরাতকে ذكر বলা হয়েছেঃ

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ এবং কোরআনকেও ذكر শব্দ

দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে, যেমন এর পরের আয়াতে أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ বলে কোরআন বোঝানো হয়েছে। অতএব أَهْلَ الذِّكْرِ-এর শাব্দিক অর্থ দাঁড়াল বিদ্বান, জ্ঞানবান। এখানে স্পষ্টতই বিদ্বান বলে গ্রন্থধারী ইহুদী ও খৃস্টান পণ্ডিতদেরকে বোঝানো হয়েছে। ইবনে আব্বাস, হাসান, সুদ্দী প্রমুখ তাই বলেছেন। কেউ কেউ এখানেও ذِكْر-এর অর্থ কোরআন ধরে أَهْلَ الذِّكْرِ-এর তফসীরে 'কোরআনধারী' বলেছেন। এ ব্যাপারে বাহ্‌রে মুহীত ও মাযহারীর বক্তব্য অধিক স্পষ্ট। তাঁরা বলেন :

المراد بأهل الذكر علماء أخبار الأمم السالفة كائنا من كان فالذكر بمعنى الحفظ كأنه قيل اسألوا المطلعين على أخبار الأمم يعلموكم بذلك -

এ ভাষ্য অনুযায়ী গ্রন্থধারী ও কোরআনধারী সবাই أَهْلَ الذِّكْرِ-এর অন্তর্ভুক্ত।

بِالْبَيِّنَاتِ--এর অর্থ সুবিদিত। এখানে মু'জিযা বোঝানো হয়েছে। زُبُر শব্দটি আসলে زُبْرَةٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ লোহার বড় খণ্ড ; যেমন এক জায়গায় বলা হয়েছে, آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ---খণ্ডসমূহকে সংযোজন করার সাথে সম্পর্ক রেখে লেখাকে زَبَر বলা হয় এবং লিখিত গ্রন্থকে زَبُور ও زُبُر বলা হয়। এখানে زُبُر বলে তওরাত, ইঞ্জীল, যবুর ও কোরআনসহ ঐশীগ্রন্থসমূহ বোঝানো হয়েছে।

মুজতাহিদ ইমামদের অনুসরণ করা অন্যদের উপর ওয়াজিব : আলোচ্য আয়াতের فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ---বাক্যটি যদিও বিশেষ বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু ভাষা ব্যাপক হওয়ার কারণে এ জাতীয় সব ব্যাপারকে শামিল করে। তাই কোরআনী বর্ণনাভঙ্গির দিক দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিগত ও ইতিহাসগত বিধি যে, যারা বিধি-বিধানের জ্ঞান রাখে না, তারা যারা জানে, তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে নেবে এবং তাদের কথামত কাজ করা জ্ঞানহীনদের উপর ফরয হবে। একেই তকলীদ (অনুসরণ) বলা হয়। এটা কোরআনের স্পষ্ট নির্দেশ এবং যুক্তিগতভাবেও এ পথ ছাড়া আমল অর্থাৎ কর্মকে ব্যাপক করার আর কোন উপায় নেই। সাহাবীগণের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কোনরূপ মতানৈক্য ছাড়াই এ বিধি পালিত হয়ে আসছে। যারা তকলীদ অস্বীকার করে, তারাও এ তকলীদ অস্বীকার করে না যে, যারা আলিম নয়, তারা আলিমদের কাছ থেকে ফতোয়া নিয়ে কাজ করবে। বলা বাহুল্য, আলিমরা

যদি অজ্ঞ জনসাধারণকে কোরআন ও হাদীসের প্রমাণাদি বলেও দেন, তবে তারা এগুলোকে আলিমদের উপর আস্থার ভিত্তিতেই গ্রহণ করবে। কারণ, তাদের মধ্যে প্রমাণাদিকে বোঝা ও পরখ করার যোগ্যতা কোথায়? জ্ঞানীদের উপর আস্থা রেখে কোন নির্দেশকে শরীয়তের নির্দেশ মনে করে পালন করার নামই তো তকলীদ। এ তকলীদ যে বৈধ বরং জরুরী, তাতে কোনরূপ মতবিরোধের অবকাশ নেই। তবে যেসব আলিম কোরআন, হাদীস ও ইজমার ক্ষেত্রসমূহ বোঝার যোগ্যতা রাখে, তারা কারও তকলীদ না করে এমন বিধি-বিধানে সরাসরি কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী কাজ করতে পারে, যেগুলো কোরআন ও হাদীসে পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত রয়েছে এবং যেগুলোতে সাহাবী ও তাবেয়ী আলিমদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। কিন্তু যেসব বিধান পরিষ্কারভাবে কোরআন ও হাদীসে উল্লিখিত নেই অথবা যেগুলোতে কোরআনী আয়াত ও হাদীসের মধ্যে বাহ্যত পরস্পর বিরোধিতা দৃষ্টিগোচর হয় অথবা যেগুলোতে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্যে আয়াত কিংবা হাদীসের অর্থ নির্ধারণে মতভেদ রয়েছে, সেসব বিধি-বিধান ইজতিহাদী বিষয়-রূপে গণ্য হয় এবং পরিভাষায় এগুলোকে 'মুজতাহাদ ফিহ্ মাস'আলা' বলে। নিজে মুজতাহিদ নয়, এমন প্রত্যেক আলিমের পক্ষেও এ জাতীয় মাস'আলায় কোন একজন মুজতাহিদ ইমামের তকলীদ করা জরুরী। ব্যক্তিগত অভিমতের ভিত্তিতে এক আয়াত কিংবা হাদীসকে অগ্রগণ্য মনে করে অবলম্বন করা এবং অন্য আয়াত কিংবা হাদীসকে অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করে ছেড়ে দেওয়া তার পক্ষে বৈধ নয়।

এমনিভাবে কোরআন ও সুন্নতে যেসব বিধানের পরিষ্কার উল্লেখ নেই, সেগুলো কোরআন ও সুন্নাহ্ বর্ণিত মূলনীতি অনুসরণ করে বের করা এবং সেগুলোর শরীয়ত-সম্মত নির্দেশ নির্ধারণ করাও এমন মুজতাহিদদের কাজ, যারা আরবী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি রাখেন; কোরআন ও সুন্নাহ্ সম্পর্কিত যাবতীয় শাস্ত্রে দক্ষতা রাখেন এবং আল্লাহ্‌ভীতি ও পরহিযগারীতে উচ্চ মর্তবায় অধিষ্ঠিত রয়েছেন। যেমন ইমাম আযম আবূ হানীফা, শাফেয়ী, মালিক, আহমদ ইবনে হাম্বল, আওযায়ী, ফকীহ আবুল্লাইস প্রমুখ। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নবুয়ত যুগের নৈকট্য এবং সাহাবী ও তাবেয়ী-গণের সংসর্গের বরকতে শরীয়তের মূলনীতি ও উদ্দেশ্য বোঝার বিশেষ রুচি এবং বর্ণিত বিধানের ওপর অবর্ণিত বিধানকে অনুমান করে শরীয়তসম্মত নির্দেশ বের করার অসাধারণ দক্ষতা দান করেছিলেন। এ জাতীয় ইজতিহাদী মাস'আলায় সাধারণ আলিম-দের পক্ষেও কোন না কোন একজন মুজতাহিদ ইমামের তকলীদ করা অপরিহার্য। মুজতাহিদ ইমামদের মতের বিরুদ্ধে কোন নতুন মত অবলম্বন করা ভুল।

এ কারণেই মুসলিম সম্প্রদায়ের আলিম, মুহাদ্দিস ও ফিকাহবিদগণ, ইমাম গাযযালী, রাযী, তিরমিযী, তাহাভী, মুযানী, ইবনে হুসাম, ইবনে কুদামা এবং এই শ্রেণীর আরও লক্ষ লক্ষ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিম আরবী ভাষা ও শরীয়ত সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ইজতিহাদী মাস'আলাসমূহে সর্বদা মুজতাহিদ ইমামদের তকলীদ করে গেছেন। তাঁরা সব ইমামের বিপরীতে নিজমতে কোন ফতোয়া দেওয়াকে বৈধ মনে করেন নি।

তবে উল্লিখিত মনীষীবৃন্দ জ্ঞান ও আল্লাহ্‌ভীতিতে অনন্যসাধারণ মর্তবার অধিকারী ছিলেন। ফলে তাঁরা মুজতাহিদ ইমামগণের উক্তি ও মতামতসমূহকে কোরআন ও সুন্নতের আলোকে যাচাই-বাছাই করতেন। অতঃপর তাঁরা যে ইমামের উক্তিকে কোরআন ও সুন্নতের অধিক নিকটবর্তী দেখতেন, সেই ইমামের উক্তি গ্রহণ করতেন। কিন্তু ইমামগণের মত ও পথের বাইরে, তাঁদের সবার বিরুদ্ধে কোন মত আবিষ্কার করাকে তাঁরা কখনও বৈধ মনে করতেন না। তকলীদের আসল স্বরূপ এতটুকুই।

এরপর দিন দিন জ্ঞানের মাপকাঠি সংকুচিত হতে থাকে এবং তাকওয়া ও আল্লাহ্‌ভীতির পরিবর্তে মানবিক স্বার্থপরতা প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে যদি কোন মাস'আলায় যে-কোন ইমামের উক্তি গ্রহণ করার এবং অন্য মাস'আলায় অন্য ইমামের উক্তি গ্রহণ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তবে এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে মানুষ শরীয়ত অনুসরণের নামে প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে যাবে। যে ইমামের উক্তিতে সে নিজ প্রবৃত্তির স্বার্থ পূর্ণ হতে দেখবে সেই ইমামের উক্তিকেই গ্রহণ করবে। বলা বাহুল্য, এরূপ করার মধ্যে ধর্ম ও শরীয়তের অনুসরণ হবে কম এবং স্বার্থ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ হবে বেশী। অথচ দীন ও শরীয়তের অনুসরণ না করে স্বার্থ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করা উম্মতের ইজমা দ্বারা হারাম। আল্লামা শাতেবী 'মুয়াফাকাত' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সাধারণ তকলীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ইবনে তাইমিয়া এ ধরনের অনুসরণকে স্বীয় ফতোয়া গ্রন্থে ইজমা দ্বারা হারাম বলেছেন। এ কারণে পরবর্তী ফিকাহবিদগণ এটা জরুরী মনে করেছেন যে, আমলকারীদের ওপর কোন একজন ইমামেরই তকলীদ করা বাধ্যতামূলক করে দেওয়া উচিত। এখান থেকেই ব্যক্তিভিত্তিক তকলীদের সূচনা হয়। এটা প্রকৃতপক্ষে একটি শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা। এর উদ্দেশ্য দীনী ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা কায়েম রাখা এবং মানুষকে দীনের আড়ালে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। হযরত উসমান গনী (রা)-র একটি কীর্তি হুবহু এর দৃষ্টান্ত। তিনি সাহাবায়ে কিরামের ইজমা তথা সর্বসম্মতিক্রমে কোরআনের সাতটি কির'আতের মধ্য থেকে মাত্র একটিকে বহাল রেখেছেন। অথচ কোরআন সাত কির'আতেই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বাসনা অনুযায়ী জিবরাঈলের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু বহির্বিশ্বে প্রচারিত হওয়ার পর সাত কির'আতে কোরআন পাঠ করার ফলে তাতে পরিবর্তনের আশংকা দেখা দেয়। তখন সাহাবীগণের সর্বসম্মতিক্রমে একই কির'আতে কোরআন লেখা ও পড়া বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়। খলীফা হযরত উসমান (রা) সেই এক কির'আতে কোরআনের অনেক কপি লিখিয়ে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেন এবং আজ পর্যন্তও সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় তা অনুসরণ করে যাচ্ছেন। এর অর্থ এরূপ নয় যে, অন্য কির'আত সঠিক ছিল না। বরং দীনের শৃঙ্খলা বিধান এবং কোরআনের হিফাযতের কারণে একটি মাত্র কির'আত অবলম্বন করা হয়েছে। এমনিভাবে সকল মুজতাহিদ ইমামই সত্য। তাদের মধ্যে কোন একজনকে তকলীদের জন্য নির্দিষ্ট করার অর্থ কখনও এরূপ নয় যে, যে ব্যক্তি যে ইমামের তকলীদ করেছে তাকে ছাড়া অন্য ইমাম তার কাছে তকলীদের যোগ্য নয়। বরং যে ইমামের মধ্যে নিজের মতাদর্শ ও সুবিধা দেখতে পায় তারই তকলীদ করে এবং অন্য ইমামদেরকেও এমনিভাবে সম্মানিত মনে করে।

উদাহরণত রোগী হাকীম ও ডাক্তারদের মধ্য থেকে কোন একজনকেই চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট করাকে জরুরী মনে করে। কারণ, সে যদি নিজ মতে এক সময় এক ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞেস করে ওষুধ পান করে এবং অন্য সময় অন্য ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞেস করে ওষুধ পান করে, তবে এটা তার ধ্বংসের কারণ হয়। অতএব সে যখন একজন ডাক্তারকে চিকিৎসার জন্য মনোনীত করে, তখন এর অর্থ কখনও এরূপ হয় না যে, অন্য ডাক্তার পারদর্শী নয় কিংবা চিকিৎসা করার যোগ্যতা রাখে না।

মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলীর যে বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার স্বরূপ এর চাইতে বেশী কিছু ছিল না। একে দলাদলির রঙ দেওয়া এবং পারস্পরিক কলহ ও মতানৈক্য সৃষ্টিতে মেতে ওঠা দীনের কাজ নয় এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আলিমগণ কোন সময় একে সুনজরে দেখেন নি। কোন কোন আলিমের আলোচনা পারস্পরিক বিতর্কের রূপ ধারণ করে, যা পরে তিরস্কার ও ভর্ৎসনার সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এরপর মূর্খতাসুলভ লড়াই ও কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে, যা আজকাল সাধারণত ধর্মপরায়ণতা ও ভ্রাতৃপ্রীতির চিহ্ন হয়ে গেছে। অতএব আল্লাহ্ তা'আলার কাছেই আমাদের অভিযোগ। ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ তকলীদ ও ইজতিহাদ সম্পর্কে এখানে যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা এ বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত সার। সাধারণ মুসলমানদের বোঝার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। পণ্ডিতসুলভ বিস্তারিত আলোচনা উসূলে ফিকাহ্‌র কিতাবাদিতে বিশেষ করে আল্লামা শাতেবীকৃত 'কিতাবুল মুয়াফাকাত' ৪র্থ খণ্ড, ইজতিহাদ অধ্যায়ে, আল্লামা সাইফুদ্দীন আমেদীকৃত 'আহকামুল আহকাম' ৩য় খণ্ড, শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভীকৃত 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' ও 'ইকদুল জীদ' এবং মাওলানা আশরাফ আলী থানভীকৃত 'আল ইসতিসাদ ওয়াল ইজতিহাদ' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

কোরআন বোঝার জন্য হাদীস জরুরী ঃ হাদীস অস্বীকার কোরআন অস্বীকারের নামান্তর ঃ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ এ আয়াতে ذكر এর অর্থ সর্বসম্মতভাবে কোরআন পাক। আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি লোকদের কাছে কোরআনের আয়াত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে দিন। এতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন পাকের তত্ত্ব, তথ্য ও বিধানাবলী নির্ভুলভাবে বোঝা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বর্ণনার উপর নির্ভরশীল। যদি প্রত্যেক ব্যক্তি শুধু আরবী ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান-লাভ করেই কোরআনের বিধানাবলী আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত পন্থায় বোঝাতে সক্ষম হত, তবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বর্ণনা ও ব্যাখ্যার দায়িত্ব অর্পণ করার কোন অর্থ থাকত না।

আল্লামা শাতেবী 'মুয়াফাকাত' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে প্রমাণ করেছেন যে, হাদীস আগাগোড়া কোরআনের ব্যাখ্যা। কেননা, কোরআন রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে বলেছে ঃ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ----হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) এই মহান চরিত্রের

ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ كان خلقه القرآن এর সারমর্ম এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে যে কোন উক্তি ও কার্য বর্ণিত রয়েছে, তা সব কোরআনেরই বক্তব্য। কোন কোনটি বাহ্যত কোন আয়াতের তফসীর ও ব্যাখ্যা, যা সাধারণ আলিমরা জানেন এবং কোন কোনটি বাহ্যত কোরআনে নেই, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অন্তরে তা ওহী হিসাবে প্রক্ষিপ্ত করা হয়। এটাও একদিক দিয়ে কোরআনই। কেননা, কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কোন কথাই মনগড়া নয়; বরং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওহী হিসাবে প্রক্ষিপ্ত। وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحٰى

এতে জানা গেল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ইবাদত, লেনদেন, চরিত্র ও অভ্যাস সবই আল্লাহ্ তা'আলার ওহী ও কোরআনী নির্দেশের অনুসৃতি। তিনি যেখানেই নিজ ইজতিহাদ দ্বারা কোন কাজ করেছেন, সেখানে ওহী কিংবা নিষেধ না করার মাধ্যমে সত্যায়ন ও সমর্থন করা হয়েছে। ফলে তাও ওহীরই অনুসৃতি।

মোটকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে কোরআনের ব্যাখ্যা ও বর্ণনাকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়তের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছে; যেমন সূরা জুম'আ ও অন্যান্য সূরার কতিপয় আয়াতে গ্রন্থ শিক্ষাদান বলে এ উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে।

অপরদিকে সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে শুরু করে পরবর্তী যুগের হাদীসবিদ পর্যন্ত প্রতিভাধর মনীষীবৃন্দ প্রাণের চাইতেও অধিক হিফাযত করে হাদীসের একটি বিশাল ভাণ্ডার আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁরা এর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সারাজীবন ব্যয় করে হাদীস বর্ণনার কিছু স্তর নির্ধারণ করেছেন। তাঁরা যেসব হাদীসকে সনদের দিক দিয়ে শরীয়তের বিধানাবলীর ভিত্তি হওয়ার যোগ্য পান নি, সেগুলোকে পৃথক করে এমন হাদীসসমূহ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন যেগুলো সারা জীবনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার পর বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে।

যদি আজ কেউ হাদীসের এই ভাণ্ডারকে কোন ছলছুঁতায় অনির্ভরযোগ্য আখ্যায়িত করে, তবে এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) কোরআনী নির্দেশ অমান্য করে কোরআনের বিষয়বস্তু বর্ণনা করেন নি; কিংবা তিনি বর্ণনা করেছিলেন, কিন্তু তা অব্যাহত ও সংরক্ষিত থাকেনি। উভয় অবস্থাতেই অর্থগতভাবে কোরআন সংরক্ষিত রইল না। অথচ এর সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা একথা বলে গ্রহণ করেছিলেন ঃ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُونَ অতএব উপরোক্ত দাবী কোরআনের এ আয়াতের পরিপন্থী হবে। এতে প্রমাণিত হল যে, যে ব্যক্তি হাদীস অস্বীকার করে, সে প্রকৃতপক্ষে কোরআনই অস্বীকার করে। نعوذ بالله

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ

أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٥﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي
تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٦﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ ۖ فَإِنَّ رَبَّكُمْ
لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٤٧﴾

(৪৫) যারা কুচক্র করে, তারা কি এ বিষয়ে ভয় করে না যে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিবেন কিংবা তাদের কাছে এমন জায়গা থেকে আযাব আসবে, যা তাদের ধারণাতীত? (৪৬) কিংবা চলাফেরার মধ্যেই তাদেরকে পাকড়াও করবে, তারা তো তা ব্যর্থ করতে পারবে না। (৪৭) কিংবা ভীতি প্রদর্শনের পর তাদেরকে পাকড়াও করবেন? তোমাদের পালনকর্তা তো অত্যন্ত নম্র, দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা (সত্য ধর্মকে পর্যুদস্ত করার জন্য) জঘন্য চক্রান্ত করে (কোথাও অমূলক সন্দেহ ও আপত্তি উত্থাপন করে এবং সত্যকে অস্বীকার করে; এটা নিজেদের বিপথ-গামিতা এবং কোথাও অপর লোকদেরকে বাধা দান করে; এটা অপরকে বিপথগামী করা।) তারা কি (কুফরের এসব কর্মকাণ্ড করে) এ বিষয় থেকে নিশ্চিন্তে (বসে) রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে (কুফরের শাস্তিতে) ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন কিংবা এমন জায়গা থেকে তাদের ওপর আযাব আসবে যে, তারা কল্পনাও করেতে পারবে না (যেমন বদর যুদ্ধে নিরস্ত্র মুসলমানদের হাতে তারা মার খেয়েছে। অথচ তারা ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারত না যে, এরা জয়ী হয়ে যাবে।) কিংবা তাদেরকে চলাফেরার মধ্যে (কোন বিপদ দ্বারা) পাকড়াও করবে (যেমন অকস্মাৎ কোন রোগ আক্রমণ করে বসে) অতএব (এগুলোর মধ্যে যদি কোনটি সংঘটিত হয়ে যায়, তবে) তারা আল্লাহ্‌কে পরাভূত (-ও) করতে পারবে না কিংবা তাদেরকে ক্রমহ্রাস করত পাকড়াও করে ফেলবে (যেমন দুর্ভিক্ষ ও মহামারী শুরু হয়ে আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে যাবে অর্থাৎ তাদের নিশ্চিন্ত না হওয়া উচিত। আল্লাহ্ সবই করতে পারেন, কিন্তু তিনি অবকাশ দিয়ে রেখেছেন;) অতএব (এর কারণ এই যে) তোমাদের পালনকর্তা অত্যন্ত স্নেহশীল, পরম দয়ালু। (তাই সময় দিয়েছেন যে, এখনও তোমাদের সুমতি ফিরে আসুক এবং তোমরা সাফল্য ও মুক্তির পথ অবলম্বন কর।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيهِمْ ----বলে কাফিরদেরকে পরকালের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদেরকে ভয়

প্রদর্শনার্থে বলা হয়েছে যে, পরকালের শাস্তির পূর্বে দুনিয়াতেও আল্লাহ্‌র আযাব তোমাদেরকে পাকড়াও করতে পারে। তোমরা যে মাটির ওপর বসে আছ, তার অভ্যন্তরেই তোমাদেরকে বিলীন করে দেওয়া যেতে পারে; কিংবা কোন ধারণাতীত জায়গা থেকে তোমরা আযাবে পতিত হতে পার; যেমন বদর যুদ্ধে এক হাজার অস্ত্রসজ্জিত বীরযোদ্ধা কয়েকজন নিরস্ত্র মুসলমানের হাতে এমন মার খেয়েছে, যার কল্পনাও তারা করতে পারত না। কিংবা এটাও হতে পারে যে, চলাফেরার মধ্যেই তোমরা কোন আযাবে গ্রেফতার হয়ে যাও; যেমন কোন দুরারোগ্য প্রাণঘাতী ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে অথবা উচ্চস্থান থেকে পতিত হয়ে অথবা শক্ত জিনিসের সাথে টক্কর লেগে মৃত্যুমুখে পতিত হতে পার কিংবা এরূপ শাস্তিও হতে পারে যে, অকস্মাৎ আযাব না এসে টাকা-পয়সা, স্বাস্থ্য এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ সামগ্রী আস্তে আস্তে হ্রাস পেতে থাকবে এবং এভাবে হ্রাস পেতে পেতে গোটা সম্প্রদায়ই একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

আয়াতে ব্যবহৃত تَخَوُّف শব্দটি خوف----ভয় করা থেকে উদ্ভূত। এ অর্থের দিক দিয়ে কেউ কেউ তফসীর করেছেন যে, একদলকে আযাবে ফেলে অপর দলকে ভয় প্রদর্শন করা হবে। এভাবে দ্বিতীয় দলকে আযাবে গ্রেফতার করে তৃতীয় দলকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা হবে। এমনিভাবে ভয় প্রদর্শন করতে করতে সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

কিন্তু তফসীরবিদ হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ প্রমুখ এখানে تَخَوُّف এর অর্থ নিয়েছেন تَنَقُّص অর্থাৎ হ্রাস পাওয়া। এদিক দিয়েই ক্রমহ্রাসপ্রাপ্তি তরজমা করা হয়েছে।

হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেন ঃ হযরত উমর ফারূক (রা)-ও تَخَوُّف শব্দের অর্থ বুঝতে সক্ষম হন নি। ফলে তিনি প্রকাশ্য মিম্বরে সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনারা تَخَوُّف শব্দের কি অর্থ বুঝেছেন? সবাই নিশ্চুপ, কিন্তু হুযায়ল গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বলল ঃ আমীরুল মু'মিনীন, এটি আমাদের গোত্রের বিশেষ ভাষা। আমাদের ভাষায় এর অর্থ تَنَقُّص অর্থাৎ আস্তে আস্তে হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়া। খলীফা জিজ্ঞেস করলেন ঃ আরব কাব্যে এই শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কি? জবাবে বলা হল ঃ হ্যাঁ। অতঃপর তিনি স্বগোত্রের কবি আবু কবীর হুযায়লীর একটি কবিতা পেশ করলেন। তাতে تَخَوُّف শব্দটি আস্তে আস্তে হ্রাস করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল। তখন খলীফা বললেন ঃ তোমরা অন্ধকার যুগের কাব্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জন কর। কারণ, তা দ্বারা কোরআনের তফসীর ও তোমাদের কথাবার্তার অর্থের ফয়সালা হয়।

কোরআন বোঝার জন্য যেমনতেন আরবী জানা যথেষ্ট নয়ঃ এ থেকে প্রথমত জানা গেল যে, আরবী ভাষা বলা ও লেখার মামুলী যোগ্যতা কোরআন বোঝার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং এতে এতটুকু দক্ষতা অর্জন করা জরুরী, যদ্দ্বারা প্রাচীন যুগের আরবদের কবিতাও পুরোপুরি বোঝা যায়। কেননা, কোরআন তাদেরই ভাষায় এবং তাদেরই

বাকপদ্ধতিতে অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই ঐ স্তরের আরবী সাহিত্য শিক্ষা করা মুসলমানদের জন্যে অপরিহার্য।

আরবী সাহিত্য শিক্ষার জন্য অন্ধকার যুগের কবিদের কাব্য পাঠ করা জায়েয ; যদিও তাতে অশ্লীল কথাবার্তা আছে ঃ এ থেকে আরও জানা গেল যে, কোরআন বোঝার জন্য অন্ধকার যুগের আরবী সাহিত্য পাঠ করা জায়েয এবং সেই যুগের শব্দার্থ ও পড়ানো জায়েয ; যদিও একথা সুপরিজ্ঞাত যে, তাদের কবিতায় জাহিলিয়াসুলভ আচরণবিধি এবং ইসলাম বিরোধী ক্রিয়াকর্ম বর্ণিত হবে। কিন্তু কোরআন বোঝার প্রয়োজনে এগুলো পড়া ও পড়ানো বৈধ করা হয়েছে।

দুনিয়ার আযাবও এক প্রকার রহমত ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে দুনিয়ার বিভিন্ন আযাব বর্ণনা করার পর সবশেষে বলা হয়েছে إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ এতে প্রথমে رب শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষকে হুঁশিয়ার করার জন্য দুনিয়ার আযাব হচ্ছে প্রতিপালকত্বের তাকিদ। এরপর তাকিদের لام সহকারে আল্লাহ্‌র দয়ালু হওয়া ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়ার হুঁশিয়ারি প্রকৃতপক্ষে স্নেহ ও দয়ার কারণেই হয়ে থাকে, যাতে গাফিল মানুষ হুঁশিয়ার হয়ে স্বীয় কর্মকাণ্ড সংশোধন করে নেয়।

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ
وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُم
مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾ ۞ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ
اثْنَيْنِ ۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿٥١﴾ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا ۚ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ
فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ﴿٥٣﴾ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ
الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا
آتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ
نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۗ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾ وَيَجْعَلُونَ

لِلّٰهِ الْبَنٰتُ سُبْحٰنَهٗ ۙ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ ۝

(৪৮) তারা কি আল্লাহ্‌র সৃজিত বস্তু দেখে না, যার ছায়া আল্লাহ্‌র প্রতি বিনীত-ভাবে সিজদাবনত থেকে ডান ও বাম দিকে ঝুঁকে পড়ে। (৪৯) আল্লাহ্‌কে সিজদা করে যা কিছু নভোমণ্ডলে আছে এবং যা কিছু ভূমণ্ডলে আছে এবং ফিরিশতাগণ; তারা অহংকার করে না। (৫০) তারা তাদের ওপর পরাক্রমশালী তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে এবং তারা যা আদেশ পায়, তা করে। (৫১) আল্লাহ্ বললেনঃ তোমরা দুই উপাস্য গ্রহণ করো না---উপাস্য তো মাত্র একজনই। অতএব আমাকেই ভয় কর। (৫২) যা কিছু নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আছে তা তাঁরই এবং তাঁরই ইবাদত করা শাশ্বত কর্তব্য। তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে ভয় করবে? (৫৩) তোমাদের কাছে যে সমস্ত নিয়ামত আছে, তা আল্লাহ্‌রই পক্ষ থেকে। অতঃপর তোমরা যখন দুঃখ-কষ্টে পতিত হও তখন তাঁরই নিকট কান্নাকাটি কর। (৫৪) এরপর যখন আল্লাহ্ তোমাদের কষ্ট দূরীভূত করে দেন, তখনই তোমাদের একদল স্বীয় পালনকর্তার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করতে থাকে, (৫৫) যাতে ঐ নিয়ামত অস্বীকার করে, যা আমি তাদেরকে দিয়েছি। অতএব মজা ভোগ করে নাও---সত্বরই তোমরা জানতে পারবে। (৫৬) তারা আমার দেওয়া জীবনোপকরণ থেকে তাদের জন্য একটি অংশ নির্ধারিত করে, যাদের কোন খবরই তারা রাখে না। আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা যে অপবাদ আরোপ করছ, সে সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। (৫৭) তারা আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সন্তান নির্ধারণ করে---তিনি পবিত্র মহিমান্বিত এবং নিজেদের জন্য ওরা তাই স্থির করে যা ওরা চায়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা কি আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তুসমূহ দেখেনি, (এবং দেখে তওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করেনি) যাদের ছায়া কখনও একদিকে, কখনও অন্যদিকে এমতাবস্থায় ঝুঁকে পড়ে যে, তারা আল্লাহ্‌র (আদেশের সম্পূর্ণ) অধীন? (অর্থাৎ ছায়ার কারণসমূহ, যেমন সূর্যের ঔজ্জ্বল্য ও ছায়াবিশিষ্ট দেহের ঘনত্ব এবং ছায়ার গতির কারণ অর্থাৎ সূর্যের গতি, এরপর ছায়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ, এগুলো সব আল্লাহ্‌র আজ্ঞাধীন) এবং (ছায়াবিশিষ্ট) সেসব বস্তুও (আল্লাহ্‌র সামনে) অক্ষম (ও তাঁরই আজ্ঞাবহ)। এবং (উল্লিখিত বস্তু-সমূহের গতিবিধি তাদের ইচ্ছাধীন নয়। ظِلٰل শব্দের দিকে) يَتَفَيَّؤُا-এর اسناد থেকে তা বোঝা যায়। কেননা ইচ্ছাগত গতিশীল বস্তুর মধ্যে ছায়ার গতি স্বয়ং সে বস্তুর গতি থেকে সৃষ্টি হয়। এসব বস্তু যেমন আল্লাহ্‌র আজ্ঞাধীন, তেমনি) আল্লাহ্ তা'আলারই আজ্ঞাধীন (ইচ্ছায়) চলমান যত বস্তু আকাশসমূহে (যেমন, ফেরেশতা) এবং পৃথিবীতে (যেমন, জীবজন্তু) বিদ্যমান রয়েছে এবং (বিশেষভাবে) ফেরেশতারা। বস্তুত তারা (ফেরেশতারা) উচ্চ স্থান ও উচ্চ মর্তবায় (অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র

আনুগত্যের ব্যাপারে) অহংকার করে না (এবং একারণেই বিশেষভাবে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও তারা مَا فِي السَّمَاوَاتِ-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।) তারা স্বীয় পালনকর্তাকে ভয় করে, যিনি সর্বোপরি এবং তাদেরকে (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) যে আদেশ দেওয়া হয় তারা তা পালন করে। আল্লাহ্ তা'আলা (সবাইকে পয়গম্বরগণের মাধ্যমে) বলেছেন, দুই (অথবা অধিক) উপাস্য সাব্যস্ত করো না। অতএব একজনই উপাস্য। (কাজেই) তোমরা বিশেষভাবে আমাকেই ভয় কর (কারণ, আমিই যখন বিশেষভাবে উপাস্য, তখন এর যেসব অত্যাবশ্যকীয় শর্ত রয়েছে---যেমন, অপার শক্তির অধিকারী হওয়া ইত্যাদি, সেগুলোও আমারই বৈশিষ্ট্য হবে। সুতরাং প্রতিশোধ ইত্যাদির ভয় আমার প্রতিই করা উচিত। শিরক প্রতিশোধস্পৃহার উন্মেষ ঘটায়। সুতরাং শিরক থেকে বেঁচে থাকা উচিত।) এবং তাঁরই (মালিকানায়) রয়েছে যাবতীয় বস্তুনিচয়, যা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে রয়েছে এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য (অর্থাৎ তিনিই যোগ্য যে, সবাই তাঁর আনুগত্য করবে। যখন একথা প্রমাণিত) অতঃপর তবুও কি আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে ভয় করছ? (এবং অপরকে ভয় করে তার পূজা করছ?) এবং (ভয়ের যোগ্য যেমন আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ নেই, তেমনি নিয়ামতদাতা ও আশার যোগ্য আল্লাহ্ ছাড়া কেউ নেই। সেমতে) তোমাদের কাছে যা কিছু (এবং যে কোন প্রকার) নিয়ামত রয়েছে, তা সবই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে। অতঃপর তোমরা যখন (সামান্য) কষ্ট পাও, তখন (তা দূরীভূত হওয়ার জন্য) তাঁর (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র) কাছেই ফরিয়াদ কর (তখন কোন বিগ্রহ-প্রতিমার কথা মনে থাকে না)। (সে সময় তোমাদের কর্মজনিত স্বীকারোক্তির দ্বারাও জানা যায় যে, তওহীদই সত্য। কিন্তু) এরপর যখন (আল্লাহ্) তোমাদের উপর থেকে কষ্টকে অপসারিত করেন, তখন তোমাদের এক (বড়) দল পালনকর্তার সাথে (পূর্ববৎ) শিরক করতে থাকে। (এর সারমর্ম এই যে) আমার দেওয়া নিয়ামতের (অর্থাৎ কষ্ট অপসারণের) নাশোকরী করে। (এটা মুক্তিগতভাবেও মন্দ।) যাক, ক্ষণিক মজা লুটে নাও (দেখ) অতিসত্বর (মৃত্যুর পরই) তোমরা জানতে পারবে। ('একদল' বলার কারণ এই যে, কিছুসংখ্যক লোক এ অবস্থা স্মরণে রেখে তাওহীদ ও ঈমানের ওপর কায়েম হয়ে যায় যেমন, বলা হয়েছে ঃ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ مُقْتَصِدٌ এবং (তারা যেসব শিরক করে, তন্মধ্যে একটি এই যে) তারা আমার দেওয়া বস্তুসমূহের মধ্যে তাদের (অর্থাৎ উপাস্যদের) অংশ স্থির করে, যাদের (উপাস্য হওয়া) সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান (এবং প্রমাণ ও সনদ) নেই। এর বিস্তারিত বিবরণ ৮ম পারার তৃতীয় রুকূতে وَجَعَلُوا لِلَّهِ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্‌র কসম, তোমাদের এসব মিথ্যা অপবাদ সম্পর্কে (কিয়ামতের দিন) অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে। (তাদের অপর একটি শিরক এই যে)

তারা আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সাব্যস্ত করে। (সোবহানাল্লাহ্, কেমন বাজে কথা)! এবং (উপরোক্ত) নিজেদের পছন্দসই (অর্থাৎ পুত্র পছন্দ করে)।

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾
يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ
فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۖ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾

(৫৮) যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখ কাল হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। (৫৯) তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে, না তাকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলবে। শুনে রাখ, তাদের ফয়সালা খুবই নিকৃষ্ট। (৬০) যারা পরকাল বিশ্বাস করে না তাদের উদাহরণ নিকৃষ্ট এবং আল্লাহ্‌র উদাহরণই মহান, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়!

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের অর্থাৎ কন্যা জন্মের সুসংবাদ দেওয়া হয়, (যা তারা আল্লাহ্‌র জন্য সাব্যস্ত করে) তখন (এতই অসন্তুষ্ট হয় যে,) সারা দিন তার মুখ বিবর্ণ হয়ে থাকে এবং সে মনে মনে জ্বলতে থাকে এবং যে বিষয়ের সংবাদ দেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ কন্যা জন্মগ্রহণ) তার লজ্জায় মানুষের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে ফেরে (এবং মনে মনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয় যে) তাকে (নবজাতকে) অপমান সহ্য করে রেখে দেবে, না (জীবিত অবস্থায় অথবা মেরে) মাটিতে পুঁতে ফেলবে। মনে রেখো, তাদের এ ফয়সালা খুবই মন্দ। (প্রথমত আল্লাহ্‌র জন্য সন্তান সাব্যস্ত করা---এটা কতই না মন্দ! এরপর সন্তানও কোন্‌টি? যাকে তারা নিজেদের জন্য এতটুকু লজ্জা ও অপমানের বিষয় বলে মনে করে।) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অভ্যাস মন্দ (দুনিয়াতেও---কারণ, তারা এ ধরনের মূর্খতায় লিপ্ত রয়েছে এবং পরকালেও---কারণ, এজন্য তাদেরকে শাস্তি ও অপমানে পতিত হতে হবে।) এবং আল্লাহ্‌র জন্য সর্বোচ্চ গুণাবলী প্রমাণিত রয়েছে (মুশরিকরা যা বলে তা নয়) এবং তিনি পরাক্রমশালী (যদি তাদেরকে দুনিয়াতে শিরকের শাস্তি দিতে চান, তবে তার পক্ষে মোটেই তা কঠিন নয়, কিন্তু

সাথে সাথেই) প্রজ্ঞাময় (-ও বটে। তাঁর অপরিমেয় প্রজ্ঞাহেতু তিনি মৃত্যুর পর পর্যন্ত শাস্তি পিছিয়ে দিয়েছেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে কাফিরদের দুটি বদ অভ্যাসের নিন্দা করা হয়েছে। প্রথম. তারা নিজেদের ঘরে কন্যা সন্তানের জন্মগ্রহণকে এত খারাপ মনে করে যে, লজ্জায় মানুষের সামনে দেখা পর্যন্ত দেয় না এবং চিন্তা করতে থাকে যে, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণের কারণে তার যে বেইয্যতি হয়েছে, তা মেনে নিয়ে সবর করবে, না একে জীবিত কবরস্থ করে এ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে! উপরন্তু মূর্খতা এই যে, যে সন্তানকে তারা নিজেদের জন্য পছন্দ করে না, তাকেই আল্লাহ্‌র সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে বলে যে, ফেরেশতারা হল আল্লাহ্ তা'আলার কন্যা।

দ্বিতীয় আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ তফসীরে বাহ্‌রে-মুহীতে ইবনে আতিয়্যার বরাত দিয়ে এ বাক্যের মর্ম উপরোক্ত দু'টি বদ অভ্যাসকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমত তাদের এ ফয়সালাটিই মন্দ যে, কন্যা সন্তান শাস্তি ও বেইয্যতির কারণ। দ্বিতীয়ত যে বস্তুকে তারা নিজেদের জন্য বেইয্যতি মনে করে, তাকে আল্লাহ্‌র সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে।

তৃতীয় আয়াতের শেষে وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ বাক্যেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণকে বিপদ ও অপমান মনে করা এবং মুখ লুকিয়ে ফেরা আল্লাহ্‌র রহস্যের মুকাবিলা করার নামান্তর। কেননা, নর ও নারীর সৃষ্টি আল্লাহ্‌র একটি সাক্ষাত প্রজ্ঞাপূর্ণ বিধি।---(রূহুল বয়ান)

মাস'আলা ঃ আলোচ্য আয়াত থেকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেল যে, কন্যা সন্তানের জন্মগ্রহণকে বিপদ ও অপমান মনে করা বৈধ নয়। এটা কাফিরদের কাজ। তফসীর রূহুল বয়ানে উল্লিখিত রয়েছে যে, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে মুসলমানদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত, যাতে অন্ধকার যুগের কুপ্রথার খণ্ডন হয়ে যায়। এক হাদীসে বলা হয়েছে, ঐ মহিলা পুণ্যময়ী, যার প্রথম গর্ভের সন্তান কন্যা হয়। কোরআন পাকের يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ---আয়াতে কন্যার কথা অগ্রে উল্লেখ করায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রথম গর্ভ থেকে কন্যা জন্মগ্রহণ করা উত্তম।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, কন্যা সন্তানদের সাথে যে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে, অতঃপর সে যদি তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে, তাহলে তার ও জাহান্নামের মধ্যে সেই সন্তানেরা প্রাচীর হয়ে দাঁড়াবে।---(রূহুল বয়ান)

মোটকথা, কন্যা সন্তানকে খারাপ মনে করা জাহিলিয়াত যুগের কুপ্রথা। এ থেকে মুসলমানদের বেঁচে থাকা উচিত এবং এর বিপরীতে আল্লাহ্‌র ওয়াদায় মুসলমানদের আনন্দিত ও সন্তুষ্ট থাকা কর্তব্য।

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ
وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ
لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٦١﴾ وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ
مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ۗ
لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَاَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ ﴿٦٢﴾ تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَآ
اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ
وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ
الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً
لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٦٤﴾ وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٦٥﴾

(৬১) যদি আল্লাহ্‌ লোকদেরকে তাদের অন্যায় কাজের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভূ-পৃষ্ঠে চলমান কোন কিছুকেই ছাড়তেন না। কিন্তু তিনি প্রতিশ্রুত সময় পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন। অতঃপর নির্ধারিত সময়ে যখন তাদের মৃত্যু এসে যাবে, তখন এক মুহূর্তও বিলম্বিত কিংবা ত্বরান্বিত করতে পারবে না। (৬২) যা নিজেদের মন চায় না তাই তারা আল্লাহ্‌র জন্য সাব্যস্ত করে এবং তাদের জিহ্বা মিথ্যা বর্ণনা করে যে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, তাদের জন্য রয়েছে আগুন এবং তাদেরকেই সর্বাগ্রে নিক্ষেপ করা হবে। (৬৩) আল্লাহ্‌র কসম, আমি আপনার পূর্বে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে রসূল প্রেরণ করেছি, অতঃপর শয়তান তাদেরকে কর্মসমূহ শোভনীয় করে দেখিয়েছে। আজ সে-ই তাদের অভিভাবক এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৬৪) আমি আপনার প্রতি এ জন্যই গ্রন্থ নাযিল করেছি, যাতে আপনি সরল পথ প্রদর্শনের জন্য তাদেরকে পরিষ্কার বর্ণনা করে দেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছে

এবং ঈমানদারকে ক্ষমা করার জন্য। (৬৫) আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তদ্দ্বারা যমীনকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেছেন। নিশ্চয় এতে তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা শ্রবণ করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যদি আল্লাহ্ তা'আলা (অন্যায়কারী) লোকদেরকে তাদের অন্যায় কর্মের (শিরক ও কুফরের) কারণে (তাৎক্ষণিকভাবে দুনিয়াতে পুরোপুরি) পাকড়াও করতেন, তবে ভূ-পৃষ্ঠের উপর (চেতনাশীল ও) চলমান কাউকে ছাড়তেন না (বরং সবাইকে ধ্বংস করে দিতেন) কিন্তু (তিনি তাৎক্ষণিকভাবে পাকড়াও করেন না বরং) একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছেন (যাতে কেউ তওবা করতে চাইলে তা করতে পারে)। অতঃপর যখন তাদের (ঐ) নির্দিষ্ট সময় (নিকটে) এসে যাবে, তখন এক মুহূর্তও (তা থেকে) পিছু সরতে পারবে না এবং এগিয়ে আসতেও পারবে না (বরং তৎক্ষণাৎ শাস্তি হয়ে যাবে।) তারা আল্লাহ্‌র জন্য সেসব বিষয় সাব্যস্ত করে যেগুলো স্বয়ং (নিজেদের জন্য) অপছন্দ করে---(যেমন, পূর্বে বর্ণিত হয়েছে وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ) এবং মুখে মিথ্যা দাবী করতে থাকে যে, তাদের (অর্থাৎ আমাদের) জন্য যদি কিয়ামত হবে বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে তাতে সর্বপ্রকার মঙ্গল (নিহিত) রয়েছে। (আল্লাহ্ বলেন, মঙ্গল আসবে কোত্থেকে? বরং) অনিবার্য কথা এই যে, কিয়ামতের দিন। তাদের জন্য রয়েছে দোযখ এবং নিশ্চয়ই তারা (দোযখে) সর্বপ্রথম নিক্ষিপ্ত হবে। হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি তাদের কুফর ও মূর্খতার কারণে দুঃখিত হবেন না। কেননা, আল্লাহ্‌র কসম, আপনার (যুগের) পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের কাছেও আমি রসূল প্রেরণ করেছিলাম, (যেমন আপনাকে তাদের কাছে পাঠিয়েছি) অতঃপর (এরা যেমন নিজেদের কুফরী কর্মসমূহকে পছন্দ করে এগুলোকে আঁকড়ে রয়েছে, তেমনি) শয়তানও তাদেরকে তাদের (কুফরী) কাজকর্ম শোভনীয় করে দেখিয়েছে। সুতরাং সে-ই (শয়তানই) আজ তাদের সহচর (যেমন দুনিয়াতে সহচর ছিল এবং তাদেরকে বিপথগামী করত। এ হচ্ছে তাদের দুনিয়ার ক্ষতি) এবং (কিয়ামতে) তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (মোট কথা এই পরবর্তীরাও পূর্ববর্তীদের মত কুফর করছে এবং তাদের মতই এদেরও শাস্তি হবে। আপনি কেন চিন্তা করবেন?) আমি আপনার প্রতি এ গ্রন্থ (কোরআন এজন্য নাযিল করিনি যে, সবাইকে সৎপথে আনা আপনার দায়িত্ব হবে; যাতে কেউ কেউ সৎপথে না আসলে আপনি দুঃখিত হবেন; বরং) শুধু এজন্য নাযিল করেছি, যাতে যে (ধর্মীয়) বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছে (যেমন, তওহীদ, পরকাল ও হালাল-হারামের বিষয়) তা আপনি (সাধারণ) লোকদের কাছে প্রকাশ করে দেন। (কোরআনের এ উপকারটি ব্যাপক।) এবং বিশ্বাসীদের (বিশেষ) হিদায়ত ও রহমতের জন্য (নাযিল করেছেন। অতএব আল্লাহ্‌র ফযলে এসব বিষয় অর্জিত হয়েছে।) আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর তদ্দ্বারা যমীনকে মৃত হওয়ার

পর জীবিত করেছেন (অর্থাৎ শুষ্ক হয়ে তার উৎপাদন শক্তি দুর্বল হওয়ার পর তাকে সতেজ করেছেন।) এতে (উল্লিখিত বিষয়ে) তাদের জন্য (তওহীদ ও নিয়ামতদাতা হওয়ার) বড় প্রমাণ রয়েছে, যারা (মনোযোগ দিয়ে এসব কথাবার্তা) শ্রবণ করে।

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿٦٦﴾

(৬৬) তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে। আমি তোমাদেরকে পান করাই তাদের উদরস্থিত বস্তুসমূহের মধ্য থেকে গোবর ও রক্ত নিঃসৃত দুগ্ধ যা পানকারীদের জন্য উপাদেয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (এছাড়া) চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যেও তোমাদের চিন্তা-ভাবনা করা দরকার। (দেখ) তাদের পেটে যে গোবর ও রক্ত (অর্থাৎ রক্তের উপকরণ) রয়েছে, তার মাঝখান দিয়ে (দুধের উপকরণ, যা রক্তেরই এক অংশ---হজমের পর পৃথক করে স্তনের প্রকৃতি অনুযায়ী বড় পরিবর্তন করে, তাকে) পরিষ্কার ও সহজে গলাধঃকরণযোগ্য দুধ (করে) আমি তোমাদেরকে পান করতে দেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

بطونه শব্দের সর্বনামটি انعام কে বোঝায়। انعام বহুবচন, স্ত্রীলিঙ্গ হওয়ার কারণে بُطُونِهَا বলা ব্যাকরণসম্মত ছিল। যেমন, সূরা মু'মিনুনে এভাবেই نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا বলা হয়েছে।

কুরতুবী এর কারণ বর্ণনা করে বলেন ঃ সূরা মু'মিনুনে বহুবচনের অর্থের দিকে লক্ষ্য করে সর্বনাম স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে এবং সূরা নাহ্‌লে বহুবচনের রেয়াত করে সর্বনাম পুংলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবদের বাচন পদ্ধতিতে এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। তারা বহুবচন শব্দের জন্য একবচন সর্বনাম ব্যবহার করে।

গোবর ও রক্তের মাঝখান দিয়ে পরিষ্কার দুধ বের করা সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেন ঃ জন্তুর ভক্ষিত ঘাস তার পাকস্থলীতে একত্রিত হলে পাকস্থলী তা সিদ্ধ করে। পাকস্থলীর এই ক্রিয়ার ফলে খাদ্যের বিষ্ঠা নিচে বসে যায় এবং দুধ

উপরে থেকে যায়। দুধের উপরে থাকে রক্ত। এরপর যকৃত এই তিন প্রকার বস্তুকে পৃথকভাবে তাদের স্থানে ভাগ করে দেয়, রক্ত পৃথক করে রগের মধ্যে চালায় এবং দুধ পৃথক করে জন্তুর স্তনে পৌঁছে দেয়। এখন পাকস্থলীতে শুধু বিষ্ঠা থেকে যায়, যা গোবর হয়ে বের হয়ে আসে।

মাস'আলা ঃ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্য ব্যবহার করা দীনদারীর পরিপন্থী নয়। তবে শর্ত এই যে, হালাল পথে উপার্জন করতে হবে এবং অপব্যয় যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। হযরত হাসান বসরী (র.) তাই বলেছেন।---(কুরতুবী)

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা আহারের সময় এরূপ দোয়া করবে---- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ ---অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এতে বরকত দিন এবং ভবিষ্যতে আরও উত্তম খাদ্য দিন। তিনি আরও বলেছেন ঃ দুধ পান করার সময় এরূপ দোয়া করবে-- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ ----অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এতে বরকত দিন এবং আরও বেশি দান করুন। এর চাইতে উত্তম খাদ্য চাওয়া হয়নি। কারণ, মানুষের খাদ্য তালিকায় দুধের চাইতে উত্তম কোন খাদ্য নেই। তাই আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর প্রথম খাদ্য করেছেন দুধ, যা মায়ের স্তন থেকে সে লাভ করে।---(কুরতুবী)

وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّ رِزْقًا حَسَنًا ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝

(৬৭) এবং খেজুর বৃক্ষ ও আঙ্গুর ফল থেকে তোমরা মদ্য ও উত্তম খাদ্য তৈরী করে থাক, এতে অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (এছাড়া) খেজুর ও আঙ্গুরের (ব্যাপারে চিন্তা করা উচিত যে, এসব) ফল-সমূহ থেকে তোমরা নেশাকর দ্রব্যাদি ও উত্তম খাদ্যসামগ্রী (যেমন শুকনো খুর্মা, কিশমিশ শরবত ও সির্কা ইত্যাদি) তৈরী করে থাক। নিঃসন্দেহে এতে (-ও তওহীদ এবং তাঁর মহান ও উদার হওয়া সম্পর্কে) সে সব লোকদের জন্য বড় দলীল রয়েছে, যারা (সুস্থ) বোধশক্তিসম্পন্ন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার সেসব নিয়ামতের উল্লেখ ছিল, যা মানুষের খাদ্য দ্রব্যাদির প্রস্তুতিতে আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর আল্লাহ্‌র নৈপুণ্য ও কুদরতের প্রকাশক।

এ প্রসঙ্গে প্রথমে দুধের কথা উল্লিখিত হয়েছে, আল্লাহ্‌র কুদরত যা চতুষ্পদ জীব-জন্তুর উদরস্থিত রক্ত ও আবর্জনা জঞ্জালের মলিনতা থেকে পৃথক করে মানুষের জন্য স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন খাদ্যের আকারে প্রদান করেছে, যার প্রস্তুতিতে মানুষের অতিরিক্ত নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয় না। এজন্যই পূর্ববর্তী আয়াতে نُسْقِيكُمْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, আমরা দুধ পান করিয়েছি।

এরপরে ইরশাদ করেছেন, খেজুর ও আঙ্গুরের ফলসমূহের মধ্য থেকেও মানুষ তার খাদ্য ও লাভজনক সামগ্রী তৈরী করে। এই বাক্যের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, খেজুর ও আঙ্গুরের ফলসমূহ থেকে নিজেদের খাদ্যোপকরণ ও লাভজনক দ্রব্যসামগ্রীর প্রস্তুতিতে মানবীয় নৈপুণ্যেরও কিছুটা অবদান রয়েছে। আর এই নৈপুণ্যের ফলেই দু'ধরনের দ্রব্যসামগ্রী তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। এর একটি হলো---মাদক দ্রব্য, যাকে মদ্য ও শরাব বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়টি হলো---উত্তম জীবনোপকরণ অর্থাৎ উত্তম রিযিক। যেমন, খেজুর ও আঙ্গুরকে তাজা খাবার হিসেবে ব্যবহার করা যায় অথবা শুকিয়ে তাকে মজুতও করে নেওয়া যায়। সুতরাং মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অপার শক্তিবলে খেজুর ও আঙ্গুর ফল মানুষকে দান করেছেন এবং তদ্দ্বারা খাদ্য ইত্যাদি প্রস্তুত করার ক্ষমতাও দিয়েছেন। এখন এটা তাদের নিজের অভিরুচি যে, কি প্রস্তুত করবে---মাদকদ্রব্য তৈরী করে বুদ্ধি-বিবেক নষ্ট করবে, না খাদ্য তৈরী করে শক্তি অর্জন করবে ?

এ তফসীর অনুযায়ী আলোচ্য আয়াত থেকে মাদকদ্রব্য অর্থাৎ মদ হালাল হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেননা, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বশক্তিমানের দান এবং সেগুলো ব্যবহার করার বিভিন্ন প্রক্রিয়া বর্ণনা করা। এগুলো সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র নিয়ামত ; যেমন যাবতীয় খাদ্যসামগ্রী এবং উপাদেয় বস্তুসমূহ। অনেক মানুষ এগুলোকে অবৈধ পন্থায়ও ব্যবহার করে। কিন্তু ভ্রান্ত ব্যবহারের ফলে আসল নিয়ামতের পর্যায় থেকে তা বিয়োজিত হয়ে যায় না। তবে এখানে কোন্ ব্যবহারটি হালাল ও কোন্‌টি হারাম, তা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। এতদসত্ত্বেও এখানে سكر-এর বিপরীত رزق حسن আনার কারণে জানা গেছে যে, سكر ভাল রিযিক নয়। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে سكر--এর অর্থ মাদকদ্রব্য, যা নেশা সৃষ্টি করে। ---(রূহুল মা'আনী, কুরতুবী, জাস্‌সাস)

(কোন কোন আলিমের মতে এর অর্থ সির্কা ও এমন নবীয, যা নেশা সৃষ্টি করে না। কিন্তু এখানে এ মতবিরোধ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।)

আলোচ্য আয়াতটি সর্বসম্মতিক্রমে মক্কায় অবতীর্ণ। মদের নিষেধাজ্ঞা এর পরে মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতটি নাযিল হওয়ার সময় মদ হালাল ছিল এবং মুসলমানরা সাধারণভাবে তা পান করত। কিন্তু তখনও এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মদ্যপান

ভাল নয়। পরবর্তীকালে স্পষ্টত শরাবকে কঠোরভাবে হারাম করার জন্য কোরআনে বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়।---(জাস্‌সাস, কুরতুবী--সংক্ষেপিত)

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا
وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ
فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ
اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٦٩﴾

(৬৮) আপনার পালনকর্তা মধুমক্ষিকাকে আদেশ দিলেনঃ পর্বতগাত্রে, বৃক্ষ এবং উঁচু চালে গৃহ তৈরী কর, (৬৯) এরপর সর্বপ্রকার ফল থেকে ভক্ষণ কর এবং আপন আপন পালনকর্তার উন্মুক্ত পথসমূহে চলমান হও। তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় নির্গত হয়। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (এ বিষটিও প্রণিধানযোগ্য যে,) আপনার পালনকর্তা মৌমাছির মনে একথা ঢেলে দিলেন যে, তুমি পাহাড়সমূহে গৃহ (অর্থাৎ মধুচক্র) তৈরী করে নাও এবং বৃক্ষসমূহে (-ও) এবং লোকেরা যে, দালানকোঠা নির্মাণ করে, তাতে (-ও চাক বানিয়ে নাও। সেমতে মৌমাছি এসব স্থানেই মধুচক্র তৈরী করে।) অতঃপর সর্বপ্রকার (বিভিন্ন) ফল থেকে (যা তোমার পছন্দসই হয়) চুষে খাও। এরপর (চুষে চাকের দিকে ফিরে আসার জন্য) স্বীয় পালনকর্তার পথসমূহে চল, যা (তোমার জন্য চলার ও মনে রাখার দিক দিয়ে) সহজ। (সেমতে মৌমাছি অনেক অনেক দূর থেকে রাস্তা না ভুলে চাকে ফিরে আসে। রস চুষে যখন চাকের দিকে ফিরে আসে, তখন) তার পেট থেকে এক-প্রকার পানীয় (অর্থাৎ মধু) নির্গত হয় যার রঙ বিভিন্ন। তাতে মানুষের (অনেক রোগের) জন্য প্রতিষেধক রয়েছে। এতে (-ও) তাদের জন্য (তওহীদ ও নিয়ামত দাতা হওয়ার) বড় প্রমাণ আছে যারা চিন্তা করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اَوْحٰى—এখানে وحى শব্দটি পারিভাষিক অর্থে নয়, আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ কাউকে কোন বিশেষ কথা গোপনে এমনভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যে, অন্য ব্যক্তি তা বুঝতে না পারে।

اَلنَّحْل----জ্ঞান, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সুকৌশলের দিক দিয়ে মৌমাছি সমস্ত জন্তুর মধ্যে বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সম্বোধনও স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে করেছেন। অন্য জন্তুদের ব্যাপারে সামগ্রিক নীতি হিসাবে اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى বলেছেন, কিন্তু এই ছোট্ট প্রাণীটির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে اَوْحٰى رَبُّكَ বলেছেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এটি অন্য জন্তুদের তুলনায় জ্ঞানবুদ্ধি, চেতনা ও বোধশক্তিতে একটি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

মৌমাছিদের বোধশক্তি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাদের শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে সুন্দররূপে অনুমান করা যায়। এই দুর্বল প্রাণীর জীবন ব্যবস্থা মানুষের রাজনীতি ও শাসননীতির সাথে চমৎকার খাপ খায়। সমগ্র আইন-শৃঙ্খলা একটি বড় মৌমাছির হাতে থাকে এবং সে-ই হয় মৌমাছিকুলের শাসক। তার চমৎকার সংগঠন ও কর্মবন্টনের ফলে গোটা ব্যবস্থা বিশুদ্ধ সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালিত হয়ে থাকে। তার অভাবনীয় ব্যবস্থা ও অলঙ্ঘনীয় আইন ও বিধিমালা দেখে মানব-বুদ্ধি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। স্বয়ং এই 'রাণী মৌমাছি' তিন সপ্তাহ সময়ের মধ্যে ছয় হাজার থেকে বার হাজার পর্যন্ত ডিম দেয়। দৈহিক গড়ন ও অঙ্গসৌষ্ঠবের দিক দিয়ে সে অন্য মৌমাছিদের চাইতে ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। সে কর্মবন্টন পদ্ধতি অনুসারে প্রজাদেরকে বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত করে। তাদের কেউ দ্বার রক্ষকের কর্তব্য পালন করে এবং অজ্ঞাত ও বাইরের জনকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেয় না। কেউ কেউ ডিমের হিফাযত করে। কেউ কেউ অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের লালন-পালনে নিয়োজিত। কেউ স্থাপত্য ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক কর্ম সমাধা করে। তাদের নির্মিত অধিকাংশ চাকে বিশ হাজার পর্যন্ত ঘর থাকে। কেউ কেউ মোম সংগ্রহ করে স্থপতিদের কাছে পৌঁছাতে থাকে। তারা মোম দ্বারা নিজেদের গৃহ নির্মাণ করে। তারা বিভিন্ন উদ্ভিদের উপর জমে থাকা সাদা ধরনের গুঁড়া থেকে মোম সংগ্রহ করে। আখের গায়ে এই সাদা গুঁড়া প্রচুর পরিমাণ বিদ্যমান থাকে। কোন কোন মৌমাছি বিভিন্ন প্রকার ফুল ও ফলের উপর বসে রস চুষে। এই রস তাদের পেটে পৌঁছে মধুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। মধু মৌমাছি ও তাদের সন্তানদের খাদ্য এবং এটি আমাদের সবার জন্য সুস্বাদু খাদ্যনির্যাস এবং নিরাময়ের ব্যবস্থাপত্র। মৌমাছিদের এই বিভিন্ন দল অত্যন্ত তৎপরতা সহকারে নিজ নিজ কর্তব্য পালন এবং সম্রাজ্ঞীর প্রত্যেকটি আদেশ মনেপ্রাণে শিরোধার্য করে নেয়। যদি কোন মৌমাছি আবর্জনার স্তূপে বসে যায়, তবে চাকের দারোয়ান তাকে ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দান করে এবং সম্রাজ্ঞীর আদেশে তাকে হত্যা করা হয়। তাদের এই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা ও কর্মকুশলতা দেখে মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়।---(আল জাওয়াহের)

أَوْحَىٰ رَبُّكَ—اتَّخِذِي---বলে যেসব নির্দেশ বোঝানো হয়েছে, তন্মধ্যে এটা হচ্ছে প্রথম নির্দেশ। এতে নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, বসবাসের জন্য প্রত্যেক জন্তু অবশ্যই গৃহ নির্মাণ করে কিন্তু মৌমাছিদেরকে এমন গুরুত্ব সহকারে নির্মাণের আদেশ দানের বৈশিষ্ট্য কি? এছাড়া এখানে শব্দও بُيُوتًا ব্যবহার করা হয়েছে, যা সাধারণত মানুষের বাসগৃহের অর্থে আসে। এতে প্রথমত ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মৌমাছিদেরকে মধু তৈরী করতে হবে। এর জন্য প্রথম থেকেই তারা একটি সুরক্ষিত গৃহ নির্মাণ করে নিক। দ্বিতীয়ত ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা যে গৃহ নির্মাণ করবে, তা সাধারণ জন্তু-জানোয়ারের গৃহের মত হবে না, বরং তার গঠন ও নির্মাণ হবে অনন্যসাধারণ। সেমতে তাদের গৃহ সাধারণ জন্তু-জানোয়ারের গৃহ থেকে ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে, যা দেখে মানব-বুদ্ধি বিস্ময়াভিভূত হয়ে যায়। তাদের গৃহ ছয় কোণাকৃতির হয়ে থাকে। স্কেল ও রুলার দিয়ে পরিমাপ করলেও তাতে চুল বরাবরও পার্থক্য ধরা পড়ে না। কোণাকৃতি ছাড়া অন্য কোন আকৃতি যেমন চতুর্ভুজ ও পঞ্চভুজ ইত্যাদি আকৃতি অবলম্বন না করার কারণ এই যে, এগুলোর কোন কোন বাহু অকেজো থেকে যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা মৌমাছিদেরকে শুধু গৃহ নির্মাণেরই নির্দেশ দেননি, বরং গৃহের অবস্থানস্থলও নির্দেশ করেছেন যে, তা কোন উচ্চস্থানে হওয়া উচিত। কারণ, উঁচুস্থানে মধু টাটকা ও স্বচ্ছ বাতাস পায় এবং দূষিত বায়ু থেকে মুক্ত থাকে। এছাড়া ভাঙনের আশংকা থেকেও নিরাপদ থাকে। বলা হয়েছে ঃ

مِنَ الْجِبَالِ وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ----অর্থাৎ এসব গৃহ পাহাড়ে, বৃক্ষে এবং সুউচ্চ দালানকোঠায় নির্মিত হওয়া উচিত, যাতে সুরক্ষিত পদ্ধতিতে মধু তৈরী হতে পারে।

ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ----এটা দ্বিতীয় নির্দেশ। এতে বলা হয়েছে যে, নিজেদের পছন্দমত ফল ও ফুল থেকে রস চুষে নাও। مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ দ্বারা বাহ্যত সারা বিশ্বের ফল-ফুল বোঝানো হয়নি, বরং যেসব ফল ও ফুল পর্যন্ত তারা অনায়াসে পৌঁছাতে পারে, সেগুলোকেই বোঝানো হয়েছে। সাবার রাণীর ঘটনায়ও كُل শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ----বলা বাহুল্য, সেখানেও সারা বিশ্বের বস্তুসামগ্রী বোঝানো হয়নি, যদ্দরুন রাণীর কাছে উড়োজাহাজ, রেল, মোটর ইত্যাদি থাকাও জরুরী হয়ে পড়ে। বরং তখনকার সব রকমারি জিনিসপত্র বোঝানো হয়েছে।

এখানেও مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ বলে তাই বোঝানো হয়েছে। মৌমাছিরা এমন সব সূক্ষ্ম ও মূল্যবান নির্যাস আহরণ করে যে, বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে মেশিনের সাহায্যেও এরূপ নির্যাস বের করা সম্ভবপর নয়।

فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا——এটা মৌমাছিকে প্রদত্ত তৃতীয় নির্দেশ। অর্থাৎ স্বীয় পালনকর্তার প্রস্তুতকৃত পথে চলমান হও। মৌমাছিরা যখন রস চুষে নেওয়ার জন্য গৃহ থেকে দূর-দূরান্তের কোথাও চলে যায়, তখন বাহ্যত তার গৃহে ফিরে আসা সুকঠিন হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য পথ সহজ করে দিয়েছেন। সেমতে কয়েক মাইল দূরে গিয়েও কোনরূপ ভুল না করে নিজ গৃহে ফিরে আসে। আল্লাহ্ তা'আলা শূন্যে তার জন্য পথ করে দিয়েছেন। কেননা, ভূপৃষ্ঠের আঁকাবাকা পথে বিপথগামী হওয়ার আশংকা থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা শূন্যকে এই নগণ্য মাছির জন্য অনুবর্তী করে দিয়েছেন, যাতে সে বিনা বাধায়, অনায়াসে গৃহে আসা-যাওয়া করতে পারে।

এরপর ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত এই নির্দেশের যথাযথ ফলশ্রুতি বর্ণনা করা হয়েছে ঃ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ——অর্থাৎ তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় বের হয়। এতে মানুষের জন্য রোগের প্রতিষেধক রয়েছে। খাদ্য ও ঋতুর বিভিন্নতার কারণে মধুর রঙ বিভিন্ন হয়ে থাকে। এ কারণেই কোন বিশেষ অঞ্চলে কোন বিশেষ ফল-ফুলের প্রাচুর্য থাকলে সেই এলাকার মধুতে তার প্রভাব ও স্বাদ অবশ্যই পরিলক্ষিত হয়। মধু সাধারণত তরল আকারে থাকে, তাই একে পানীয় বলা হয়েছে। এ বাক্যেও আল্লাহ্র একত্ব ও অপার শক্তির অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান। একটি ছোট্ট প্রাণীর পেট থেকে কেমন উপাদেয় ও সুস্বাদু পানীয় বের হয়! অথচ প্রাণীটি স্বয়ং বিষাক্ত। বিষের মধ্যে এই বিষ-প্রতিষেধক বাস্তবিকই আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির অভাবনীয় নিদর্শন। এরপর সর্বশক্তিমানের আশ্চর্যজনক কারিগরি দেখুন, অন্যান্য দুধের জন্তুর দুধ ঋতু ও খাদ্যের পরিবর্তনে লাল ও হলদে হয় না, কিন্তু মৌমাছির মধু বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে।

فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ——মধু যেমন বলকারক খাদ্য এবং রসনার জন্য আনন্দ ও তৃপ্তিদায়ক, তেমনি-রোগ-ব্যাধির জন্যও ফলদায়ক ব্যবস্থাপত্র। কেন হবে না, স্রষ্টার ভ্রাম্যমাণ মেশিন সর্বপ্রকার ফল-ফুল থেকে বলকারক রস ও পবিত্র নির্যাস বের করে সুরক্ষিত গৃহে সঞ্চিত রাখে। যদি গাছ-গাছড়ার মধ্যে আরোগ্যলাভের উপাদান নিহিত থাকে, তবে এসব নির্যাসের মধ্যে কেন থাকবে না? কফজনিত রোগে সরাসরি এবং অন্যান্য রোগে অন্যান্য উপাদানের সাথে মিশ্রিত হয়ে মধু ব্যবহৃত হয়। চিকিৎসকরা মাজুন তৈরী করতে গিয়ে বিশেষভাবে একে অন্তর্ভুক্ত করেন। এর আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, নিজেও

নষ্ট হয় না এবং অন্যান্য বস্তুকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত নষ্ট হতে দেয় না। এ কারণেই হাজারো বছর ধরে চিকিৎসকরা একে এলকোহল (Alcohol)-এর স্থলে ব্যবহার করে আসছেন। মধু বিরেচক এবং পেট থেকে দূষিত পদার্থ অপসারক। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে কোন এক সাহাবী তাঁর ভাইয়ের অসুখের বিবরণ দিলে তিনি তাকে মধু পান করানোর পরামর্শ দেন। দ্বিতীয় দিনও এসে আবার সাহাবী বললেনঃ অসুখ পূর্ববৎ বহাল রয়েছে। তিনি আবারও একই পরামর্শ দিলেন। তৃতীয় দিনও যখন সংবাদ এল যে, অসুখে কোন পার্থক্য হয়নি, তখন তিনি বললেনঃ صدق الله وكذب بطن أخيك---অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উক্তি নিঃসন্দেহে সত্য, তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যাবাদী। উদ্দেশ্য এই যে, ওষুধের দোষ নেই। রোগীর বিশেষ মেযাজের কারণে ওষুধ দ্রুত কাজ করেনি। এরপর রোগীকে আবার মধু পান করানো হয় এবং সে সুস্থ হয়ে উঠে।

আলোচ্য আয়াতে شفاء শব্দটি نكرة تحت الاثبات---এতে মধু যে প্রত্যেক রোগের ওষুধ, তা বুঝা যায় না। কিন্তু تعظيم বা تنوين শব্দের شفاء এর অর্থ দিচ্ছে, তা থেকে অবশ্যই বোঝা যায় যে, মধুর নিরাময়শক্তি বিরাট ও স্বতন্ত্র ধরনের। কিছুসংখ্যক আল্লাহ্‌ওয়ালা বুযুর্গ এমনও রয়েছেন, যাঁরা মধু সর্বরোগের প্রতিষেধক হওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ। তাঁরা মহান পালনকর্তার উক্তির বাহ্যিক অর্থেই এমন প্রবল ও অটল বিশ্বাস রাখেন যে, তাঁরা ফোঁড়া ও চোখের চিকিৎসাও মধুর মাধ্যমে করেন এবং দেহের অন্যান্য রোগেরও। হযরত ইবনে ওমর (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁর শরীরে ফোঁড়া বের হলেও তিনি তাতে মধুর প্রলেপ দিয়ে চিকিৎসা করতেন। এর কারণ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনে কি মধু সম্পর্কে বলেননি যে, فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ---(কুরতুবী)।

বান্দার সাথে আল্লাহ্ তদ্রূপ ব্যবহারই করেন, যেরূপ বান্দা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখে। হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছেঃ انا عند ظن عبدى بى অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেনঃ বান্দা আমার প্রতি যে ধারণা পোষণ করে, আমি তার কাছেই থাকি (অর্থাৎ ধারণার অনুরূপ করে দেই)।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ---আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তির উল্লিখিত দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করার পর মানুষকে পুনরায় চিন্তা-ভাবনার আহবান জানিয়েছেন যে, তোমরা শক্তির এসব দৃষ্টান্ত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে দেখ, আল্লাহ্ মৃত যমীনকে পানি বর্ষণের মাধ্যমে জীবিত করে দেন। তিনি ময়লা ও অপবিত্র বস্তুর মাঝখান দিয়ে তোমাদের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুপেয় দুধের নালি প্রবাহিত করেন। তিনি আঙ্গুর ও খেজুর বৃক্ষে মিষ্ট ফল সৃষ্টি করেন, যদ্দ্বারা তোমরা সুস্বাদু শরবত ও মোরব্বা তৈরী কর। তিনি একটি ছোট্ট বিষাক্ত প্রাণীর মাধ্যমে তোমাদের জন্য মুখ-

রোচক খাদ্য ও নিরাময়ের চমৎকার উপাদান সরবরাহ করেন। এরপরও কি তোমরা দেব-দেবীরই আরাধনা করবে? এরপরও কি তোমাদের ইবাদত ও আনুগত্য স্রষ্টা ও মালিকের পরিবর্তে পাথর ও কাঠের নিষ্প্রাণ মূর্তিদের জন্য নিবেদিত হবে? ভালোভাবে বুঝে নাও, এ বিষয়টিও কি তোমাদের বোধগম্য হতে পারে যে, এগুলো সব কোন অন্ধ, বধির, চেতনাহীন বস্তুর লীলাখেলা হবে? শিল্প-কারিগরির এই অসংখ্য উজ্জ্বল নিদর্শন, জ্ঞান ও কৌশলের এই বিস্ময়কর কীর্তি এবং বুদ্ধি-বিবেকের এই চমৎকার ফয়সালা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করছে, আমাদের একজন স্রষ্টা---অদ্বিতীয় ও প্রজ্ঞাময় স্রষ্টা। তিনিই ইবাদত ও আনুগত্যের যোগ্য। তিনিই বিপদ বিদূরণকারী এবং শোকর ও হামদ তাঁর জন্যই শোভনীয়।

কতিপয় বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ (১) আয়াত থেকে জানা গেল যে, বুদ্ধি-বিবেক ও চেতনা মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর মধ্যেও আছে। وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ তবে বুদ্ধির স্তর বিভিন্নরূপ। মানুষের বুদ্ধি সবচাইতে পূর্ণাঙ্গ। এ কারণেই সে শরীয়তের বিধি-বিধান পালন করার আদেশপ্রাপ্ত হয়েছে। উন্মাদনার কারণে যদি মানুষের বুদ্ধিবিভ্রম ঘটে, তবে অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানুষও বিধি-বিধান পালনের দায় থেকে অব্যাহতি লাভ করে।

(২) মৌমাছির আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ الذباب كلها في النار يجعلها عذابا لأهل النار إلا النحل---অর্থাৎ অন্যান্য ইতর প্রাণীর ন্যায় মাছিদের সব প্রকারও জাহান্নামে যাবে এবং জাহান্নামীদের আযাবের হাতিয়ার করা হবে, কিন্তু মৌমাছি জাহান্নামে যাবে না।---(কুরতুবী) অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) মৌমাছিকে মারতে নিষেধ করেছেন।---(আবূ দাউদ)

(৩) চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, মধু মৌমাছির বিষ্ঠা, না মুখের লালা। দার্শনিক এরিস্টটল কাঁচের একটি উৎকৃষ্ট পাত্রে চাক তৈরী করে তাতে মৌমাছিদেরকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এভাবে তিনি তাদের কর্মপদ্ধতি নিরীক্ষণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মৌমাছিরা সর্বপ্রথম পাত্রের অভ্যন্তরভাগে মোম ও কাদার একটি মোটা প্রলেপ বসিয়ে দেয় এবং অভ্যন্তরভাগ পূর্ণরূপে আবৃত না হওয়া পর্যন্ত কাজই শুরু করেনি।

হযরত আলী (রা) দুনিয়ার নিকৃষ্টতার উদাহরণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেনঃ

اشرف لباس بني آدم فيه لعاب دودة واشرف شرابه رجيع نحلة

অর্থাৎ মানুষের সর্বোত্তম বস্ত্র রেশম হচ্ছে একটি ছোট্ট কীটের থুথু এবং সর্বোৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু পানীয় হচ্ছে মৌমাছির বিষ্ঠা।

(৪) فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ আয়াতের মর্ম অনুযায়ী আরও জানা গেল যে, ওষুধের মাধ্যমে রোগের চিকিৎসা করা বৈধ। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা একে নিয়ামত হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةٌ

لِلْمُؤْمِنِيْنَ হাদীসে ওষুধ ব্যবহার ও চিকিৎসার প্রতি উৎসাহ দান করা হয়েছে।

কেউ কেউ রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করেন ঃ আমরা কি ওষুধ ব্যবহার করব? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, রোগের চিকিৎসা করবে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা যত রোগ সৃষ্টি করেছেন, তার ওষুধও সৃষ্টি করেছেন। তবে একটি রোগের চিকিৎসা নেই। সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন ঃ সেটি কোন্ রোগ? তিনি বললেন ঃ বার্ধক্য।---(আবূ দাউদ, কুরতুবী)

এক রেওয়ায়েতে হযরত খুযায়মা (রা) বলেন ঃ একবার আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আমরা ঝাড়-ফুঁক করি কিংবা ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা করি। এ ধরনের আত্মরক্ষা ও হিফাযতের ব্যবস্থা আল্লাহ্‌র তকদীরকে পাল্টে দিতে পারে কি? তিনি বললেন ঃ এগুলোও তো তকদীরেরই প্রকারভেদ।

মোটকথা, চিকিৎসা করা ও ওষুধ ব্যবহার করা যে বৈধ এ বিষয়ে সকল আলিমই একমত এবং এ সম্পর্কে বহু হাদীস ও রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। হযরত ইবনে ওমরের পরিবারে কাউকে বিচ্ছু দংশন করলে তাকে তিরইয়াক (বিষনাশক ওষুধ) পান করানো হত এবং ঝাড়-ফুঁক দ্বারা তার চিকিৎসা করা হত। তিনি একবার কাঁপুনির রোগীকে দাগ লাগিয়ে তার চিকিৎসা করেন। ---(কুরতুবী)

কোন কোন সূফী বুযুর্গ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা চিকিৎসা পছন্দ করতেন না। সাহাবীগণের মধ্যেও কারও কারও কার্যক্রম থেকে তা প্রকাশ পায়। যেমন হযরত ইবনে মসউদ (রা) অসুস্থ হয়ে পড়লে হযরত উসমান (রা) তাঁকে দেখতে যান এবং জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনার অসুখটা কি? তিনি উত্তর দিলেন ঃ আমি নিজ গোনাহের কারণে চিন্তিত। হযরত উসমান (রা) বললেন ঃ তাহলে কি চান? উত্তর হল ঃ আমি পালনকর্তার রহমত প্রার্থনা করি। হযরত উসমান (রা) বললেন ঃ আপনি পছন্দ করলে চিকিৎসক ডেকে আনি। তিনি উত্তর দিলেন ঃ চিকিৎসকই তো আমাকে শয্যাশায়ী করেছেন। (এখানে রূপক অর্থে চিকিৎসক বলে আল্লাহ্ তা'আলাকে বোঝানো হয়েছে)।

কিন্তু এ ধরনের ঘটনা প্রমাণ নয় যে, তাঁরা চিকিৎসাকে মকরূহ্ মনে করতেন। সম্ভবত এটা তখন তাঁদের রুচিবিরুদ্ধ ছিল। তাই তাঁরা একে পছন্দ করেন নি। এটা প্রবল আল্লাহ্‌ভীতি ও আল্লাহ্‌প্রেমে মত্ত থাকার ফলে বান্দার একটা সাময়িক অবস্থা মাত্র। কাজেই একে চিকিৎসা অবৈধ অথবা মকরূহ্ হওয়ার প্রমাণ হিসাবে দাঁড় করানো যায়

না। হযরত উসমান (রা) কর্তৃক চিকিৎসক ডেকে আনার অনুরোধ স্বয়ং চিকিৎসা বৈধ হওয়ার প্রমাণ। বরং কোন কোন অবস্থায় চিকিৎসা ওয়াজিবও হয়ে যায়।

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝

(৭০) আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এরপর তোমাদের মৃত্যুদান করেন। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ পৌঁছে যায় জরাগ্রস্ত অকর্মণ্য বয়সে, ফলে যা কিছু তারা জানত সে সম্পর্কে তারা সজ্ঞান থাকবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিজ্ঞ সর্বশক্তিমান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (নিজ অবস্থাও প্রণিধানযোগ্য যে) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে (প্রথম) সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর (বয়স শেষ হয়ে গেলে) তোমাদের জান কবজ করেন (তন্মধ্যে কেউ কেউ তো পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ চৈতন্যসহ সে অবস্থায় কার্যক্ষম হাত-পা নিয়ে বিদায় হয়ে যায়) এবং তোমাদের কেউ অকর্মণ্য বয়স পর্যন্ত পৌঁছে যায় (তার মধ্যে শারীরিক ও জ্ঞানগত শক্তি বলতে কিছুই থাকে না) এর ফলে যে কোন বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান হওয়ার পর অজ্ঞান হয়ে যায় (যেমন, কোন কোন বৃদ্ধকে দেখা যায় যে, কোন কথা বলা হলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা তা ভুলে যায় এবং সে সম্পর্কে পুনরায় জিজ্ঞেস করতে থাকে।) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত জ্ঞানী, অত্যন্ত শক্তিমান (জ্ঞান দ্বারা প্রত্যেকটি উপযোগিতা জেনে নেন এবং শক্তিবলে তদ্রূপই করে দেন। তাই জীবন ও মরণের অবস্থা বিভিন্নরূপ করে দিয়েছেন। এটাও তওহীদের একটি প্রমাণ।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইতিপূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা পানি, উদ্ভিদ, জন্তু ও মৌমাছির বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করে স্বীয় অপার শক্তি এবং সৃষ্ট জীবের প্রতি তাঁর নিয়ামতরাজির কথা মানুষকে অবহিত করেছেন। এখন আলোচ্য আয়াতে মানুষকে নিজের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্ক চিন্তা-ভাবনা করার দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে যে, মানুষ কিছুই ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অস্তিত্বের সম্পদ দ্বারা ভূষিত করেছেন। এরপর যখন ইচ্ছা করেন মৃত্যু প্রেরণ করে এ নিয়ামত খতম করে দেন। কোন কোন লোককে মৃত্যুর পূর্বেই বার্ধক্যের এমন স্তরে পৌঁছে দেন যে, তাদের জ্ঞানবুদ্ধি বিলুপ্ত হয়ে যায়, হাত-পা হীনবল ও নিঃসাড় হয়ে পড়ে এবং তারা কোন বিষয় বুঝতে পারে না, কিংবা বুঝেও স্মরণ রাখতে পারে না। বিশ্বজোড়া এই পরিবর্তন থেকে বোঝা যায় যে, যিনি স্রষ্টা ও প্রভু, তাঁর ভাণ্ডারেই যাবতীয় জ্ঞান ও শক্তি সংরক্ষিত।

وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ—এখানে مَن يُرَدُّ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পূর্বেও মানুষের উপর দিয়ে এক প্রকার দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। সেটা ছিল তার প্রাথমিক শৈশবের যুগ। তখন সে কোনরূপ জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী ছিল না। তার হস্তপদ ছিল দুর্বল ও অক্ষম। সে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করতে এবং উঠাবসা করতে অপরের মুখাপেক্ষী ছিল। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে যৌবন দান করেছেন এটা ছিল তার উন্নতির যুগ। এরপর ক্রমান্বয়ে তাকে বার্ধক্যের স্তরে পৌঁছে দেন। এ স্তরে তাকে দুর্বলতা, শক্তিহীনতা ও ক্ষয়ের ঐ সীমায় প্রত্যাবর্তিত করা হয়, যা শৈশবে ছিল।

أَرْذَلِ الْعُمُرِ বলে বার্ধক্যের সে বয়স বোঝানো হয়েছে, যাতে মানুষের দৈহিক ও মানসিক শক্তি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। রসূলুল্লাহ্ (সা) এ বয়স থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে বলতেন ঃ

اللهم انى اعوذ بك من سوء العمر وفى رواية من ان ارد الى...

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি মন্দ বয়স থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি। এক রেওয়ায়েতে আছে, অকর্মণ্য বয়সে ফিরিয়ে দেওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

ارذل العمر—এর নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা নেই। তবে উল্লিখিত সংজ্ঞাটি অগ্রগণ্য মনে হয়। কোরআনও এর প্রতি لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا বলে ইঙ্গিত করেছে। অর্থাৎ যে বয়সে হুশ-জ্ঞান অবশিষ্ট না থাকে। ফলে সে সব জানা বিষয়ও ভুলে যায়।

أَرْذَلِ الْعُمُرِ—এর সংজ্ঞা সম্পর্কে আরও অনেক উক্তি বর্ণিত রয়েছে। কেউ ৮০ বছর বয়সকে এবং কেউ ৯০ বছর বয়সকে ارذل العمر বলেছেন। হযরত আলী (রা) থেকে ৭৫ বছর বয়সের কথা বর্ণিত আছে।—(মাযহারী)

لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا—বার্ধক্যের সর্বশেষ স্তরে পৌঁছার পর মানুষের মধ্যে দৈহিক ও মানসিক শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। ফলে সে এক বিষয়ে জ্ঞাত হওয়ার পর পুনরায় অজ্ঞ হয়ে যায়। সে আদ্যোপান্ত স্মৃতিভ্রমে পতিত হয়ে প্রায় সদ্যপ্রসূত শিশুর মত হয়ে যায়, আর কোন কিছুর খবর থাকে না। হযরত ইকরামা (রা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিয়মিত কোরআন তিলাওয়াত করে সে এরূপ অবস্থায় পতিত হবে না।

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ—নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, মহাশক্তিশালী। তিনি জ্ঞান দ্বারা প্রত্যেকের বয়স জানেন এবং শক্তি দ্বারা যা চান, করেন। তিনি ইচ্ছা করলে

শক্তিশালী যুবকের ওপর অকর্মণ্য বয়সের লক্ষণাদি চাপিয়ে দেন এবং ইচ্ছা করলে এক শ' বছরের বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিকেও শক্ত সমর্থ যুবক করে রাখেন। এসবই লা-শরীক সত্তার ক্ষমতাধীন।

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَآدِّىْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ ۭ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٧١﴾

(৭১) আল্লাহ্ তা'আলা জীবনোপকরণে তোমাদের একজনকে অন্যজনের চাইতে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। অতএব যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা তাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদেরকে স্বীয় জীবিকা থেকে এমন কিছু দেয় না, যাতে তারা এ বিষয়ে তাদের সমান হয়ে যাবে। তবে কি তারা আল্লাহ্র নিয়ামত অস্বীকার করে?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (তওহীদ প্রমাণের সাথে শিরকের দোষ এক প্রকার পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে শোন,) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের একজনকে অন্যজনের চাইতে জীবিকায় (অর্থাৎ জীবিকার ক্ষেত্রে) শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন (উদাহরণত একজনকে ধনী এবং অনেকের উপর কর্তৃত্ব দান করেছেন, তার হাতে তার অধীনস্ত লোকেরা রিযিক প্রাপ্ত হয়। আবার অন্যজনকে তার মুখাপেক্ষী করেছেন। সে কর্তাব্যক্তির হাত দিয়েই রিযিক পায়। পক্ষান্তরে কাউকে এমন ধনী করেন নি যে, অধীনস্থ বা অসহায়দের দিতে পারে এবং অসহায় অধিনস্থও করেন নি যে, সে কোন কর্তৃত্বকারীর হাত থেকে পাবে) অতএব যাদেরকে (জীবিকার বিশেষ) শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে (যে, তাদের কাছে ধন ও অধীনস্থ লোক সবই আছে) তারা স্বীয় অংশের ধন অধীনদেরকে এভাবে কখনও দেয় না যে, তারা (ধনবান ও নির্ধন) সবাই এতে সমান হয়ে যায়। (কেননা, যদি কোন দাসকে দাসত্ব বজায় রেখে ধন দেয়, তবে সে দাস ধনের মালিকই হবে না বরং দাতাই পূর্ববৎ মালিক থাকবে। পক্ষান্তরে মুক্ত করার পর সমতা সম্ভবপর, কিন্তু সে তখন দাস থাকবে না। সুতরাং বোঝা গেল যে, সমতা ও দাসত্ব সম্ভবপর নয়। এমনিভাবে প্রতিমা বিগ্রহ ইত্যাদি যখন মুশরিকদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলার মালিকানাধীন দাস, তখন দাস হওয়া সত্ত্বেও উপাস্যতায় আল্লাহ্র সমতুল্য কেমন করে হয়ে যাবে? এতে শিরকের চরম দোষ বর্ণিত হয়েছে যে, যখন তোমাদের দাস রিযিকে তোমাদের অংশীদার হতে পারে না, তখন আল্লাহ্ তা'আলার দাস উপাস্যতায় তার অংশিদার কিরূপে হতে পারবে?) এরপর (অর্থাৎ এসব বিষয়বস্তু শোনার পরও) কি (তারা আল্লাহ্র শিরক করে, যদ্দরুন যুক্তিগতভাবে জরুরী হয়ে পড়ে যে, তারা) আল্লাহ্র নিয়ামত (অর্থাৎ আল্লাহ্ নিয়ামত দিয়েছেন বলেই) অস্বীকার করে?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইতিপূর্বেকার আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় জ্ঞান ও শক্তির বিশেষ বিশেষ প্রতীক এবং মানুষকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করে তওহীদের প্রকৃতিগত প্রমাণাদি বর্ণনা করেছেন। এসব প্রমাণ দেখে সামান্য জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও কোন সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে তাঁর জ্ঞান ও শক্তি ইত্যাদি গুণাবলীতে অংশীদার মেনে নিতে পারে না। আলোচ্য আয়াতে তওহীদের এ বিষয়বস্তুকেই একটি পারস্পরিক আদান-প্রদানের দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। দৃষ্টান্তটি এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ তাৎপর্যবশতই মানুষের উপকারার্থে জীবিকার ক্ষেত্রে সব মানুষকে সমান করেন নি, বরং একজনকে অপরজনের চাইতে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে বিভিন্ন স্তর সৃষ্টি করেছেন। কাউকে এমন ধনাঢ্য করেছেন যে, সে বিভিন্ন সাজ-সরঞ্জাম, চাকর-নওকর ও দাসদাসীর অধিকারী। নিজেও ইচ্ছামত ব্যয় করে এবং গোলাম ও চাকর-নফররাও তার হাত থেকে রিযিক পায়। অপরপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে গোলাম ও খাদেম করেছেন। সে অন্যের জন্য ব্যয় করা দূরের কথা, নিজের ব্যয়ও অন্যের হাত থেকে পায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে মধ্যবিত্ত করেছেন। সে অপরের জন্য ব্যয় করার মত ধনীও নয় এবং নিজ প্রয়োজনের ব্যাপারে অপরের মুখাপেক্ষী হওয়ার মত নিঃস্বও নয়।

এই প্রাকৃতিক বণ্টনের ফলশ্রুতি সবার চোখের সামনে। যাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে ধনাঢ্য করা হয়েছে, সে কখনও এটা পছন্দ করে না যে, নিজের ধন-সম্পত্তি গোলাম ও খাদেমের মধ্যে বিলি বণ্টন করে দেবে, যার ফলে তারাও ধনসম্পত্তিতে তার সমান হয়ে যাবে।

এ দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা দরকার যে, মুশরিকদের স্বীকারোক্তি মতেই যখন প্রতিমা ও অন্যান্য উপাস্য সৃষ্টজীব আল্লাহ্ তা'আলার সৃজিত ও মালিকানাধীন, তখন তারা এটা কিরূপে পছন্দ করে যে, এসব সৃষ্ট ও মালিকানাধীন বস্তু স্রষ্টা ও মালিকের সমান হয়ে যাবে? তারা কি এসব নিদর্শন দেখে এবং বিষয়বস্তু শুনেও আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক ও সমতুল্য সাব্যস্ত করে? এরূপ করার অনিবার্য পরিণতি এই যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতরাজি অস্বীকার করে। কেননা, তারা যদি স্বীকার করত যে, এসব নিয়ামত একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার দান, স্বকল্পিত প্রতিমা অথবা কোন মানুষ ও জ্বিনের কোন হাত নেই, তবে এগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলার সমতুল্য কিরূপে সাব্যস্ত করত?

এ বিষয়বস্তুই সূরা রূমের নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে ঃ

ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَل لَّكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ -

তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই একটি উদাহরণ দিচ্ছেন, যারা তোমাদের মালিকানাধীন গোলাম, তারা কি আমার দেওয়া রিযিকে তোমাদের অংশীদার যে, তোমরা তাতে তাদের সমান হয়ে যাও?

এ আয়াতের সারকথাও তাই যে, তোমরা স্বীয় মালিকানাধীন গোলাম ও খাদেম-দেরকে নিজেদের সমতুল্য করা পছন্দ কর না। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার জন্য কিরূপে পছন্দ কর যে, তাঁর সৃজিত ও মালিকানাধীন বস্তুসমূহ তাঁর সমান হয়ে যাবে।

জীবিকার শ্রেণী-বিভেদ মানুষের জন্য রহমতস্বরূপ ঃ আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট-ভাবে এ কথা বলা হয়েছে যে, দারিদ্র্য, ধনাঢ্যতা এবং জীবিকায় মানুষের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া যেমন, কারো দরিদ্র হওয়া কিংবা ধনী ও মধ্যবিত্ত হওয়া কোন আকস্মিক ঘটনা নয়; বরং এটা আল্লাহ্র অপার রহস্য ও মানবিক উপকারিতার তাগিদ এবং মানব জাতির জন্য রহমতস্বরূপ। যদি এরূপ না হয় এবং ধন-দৌলতে সব মানুষ সমান হয়ে যায়, তবে বিশ্ব-ব্যবস্থায় ত্রুটি ও অনর্থ দেখা দেবে। তাই যেদিন থেকে পৃথিবীতে জনবসতি স্থাপিত হয়েছে, সেদিন থেকে কোন যুগে ও কোন সময়ে সব মানুষ ধন-সম্পদের দিক দিয়ে সমান হয়নি এবং হতে পারে না। যদি কোথাও জোর জবরদস্তিমূলকভাবে এরূপ সাম্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তবে কিছু দিনের মধ্যে মানবিক কাজ-কারবারে ত্রুটি ও অনর্থ দৃষ্টি-গোচর হবে। আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র মানবজাতিকে বুদ্ধি, মেধা, বল, শক্তি ও কর্মদক্ষতায় বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন এবং তাদের মধ্যে উচ্চ, নীচ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিদ্যমান রয়েছে। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথা অস্বীকার করতে পারে না। এরই অপরিহার্য পরিণতি হিসাবে ধনসম্পদেও বিভিন্ন শ্রেণী থাকা বাঞ্ছনীয়, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ প্রতিভা ও যোগ্যতার যথোপযুক্ত প্রতিদান পেতে পারে। যদি প্রতিভাবান যোগ্য ব্যক্তিকে অযোগ্যের সমান করে দেওয়া হয়, তবে যোগ্য ব্যক্তির মনোবল ভেঙ্গে যাবে। যদি জীবিকায় তাকে অযোগ্যদের সমপর্যায়েই থাকতে হয়, তবে কিসে তাকে অধ্যবসায়, গবেষণা ও কর্মে উদ্বুদ্ধ করবে? এর অনিবার্য পরিণতিতে কর্মদক্ষতায় বন্ধ্যাত্ব নেমে আসবে।

সম্পদ পুঞ্জীভূত করার বিরুদ্ধে কোরআনের বিধান ঃ তবে সৃষ্টিকর্তা যেখানে বুদ্ধিগত ও দেহগত শক্তিতে একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং এর অধীনে রিযিক ও ধনসম্পদে তারতম্য করেছেন, যেখানে এই অটল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, সম্পদের ভাণ্ডার এবং জীবিকা উপার্জনের কেন্দ্রসমূহ যেন কতিপয় ব্যক্তি অথবা বিশেষ শ্রেণীর অধিকারভুক্ত না হয়ে পড়ে, ফলে অন্যান্য যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তির কাজ করার ক্ষেত্রই অবশিষ্ট না থাকে। অথচ সুযোগ পেলে তারা দৈহিক শক্তি ও জ্ঞান-বুদ্ধি খাঁটিয়ে অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জন করতে পারে। কোরআন পাক সূরা হাশরে বলে ঃ

كَيْلَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ — অর্থাৎ আমি সম্পদ বণ্টনের আইন এজন্য তৈরী করেছি, যাতে ধনসম্পদ পুঁজিপতিদের হাতে পুঞ্জীভূত না হয়ে পড়ে।

আজকাল বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে হাহাকারপূর্ণ অবস্থা বিরাজমান, তা এই আল্লাহ্র আইন উপেক্ষা করারই ফলশ্রুতি। একদিকে রয়েছে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এতে সুদ ও জুয়ার সাথে ধনসম্পদের কেন্দ্রসমূহের উপর কতিপয় ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে অবশিষ্ট জনগণকে তাদের অর্থনৈতিক দাসত্ব স্বীকারে বাধ্য করে। তাদের জন্য নিজেদের অভাব মেটানোর জন্য দাসত্ব ও মজুরী

ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা থাকে না। তারা যোগ্যতা সত্ত্বেও শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে পা রাখতে পারে না।

পুঁজিপতিদের এই অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রতিক্রিয়া হিসাবে একটি পরস্পর বিরোধী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কম্যুনিজম বা সোশ্যালিজম নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ শ্লোগান হচ্ছে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য মেটানো এবং সর্বস্তরে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। পুঁজিবাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ জনগণ এ শ্লোগানের পেছনে ধাবিত হয়েছে। কিন্তু কিছু-দিন যেতে না যেতেই তারা উপলব্ধি করেছে যে, এ শ্লোগানটি নিছক একটি প্রতারণা। অর্থনৈতিক সাম্যের স্বপ্ন কোনদিনই বাস্তবায়িত হয়নি। দরিদ্র নিজ দারিদ্র্য, অনাহার ও উপবাস সত্ত্বেও একটি মানবিক সম্মানের অধিকারী ছিল, অর্থাৎ সে নিজ ইচ্ছার মালিক ছিল। কম্যুনিজমে এ মানবিক সম্মানও হাতছাড়া হয়ে গেল। এ ব্যবস্থায় মেশিনের কলকব্জার চাইতে অধিক মানুষের কোন মূল্য নেই। এতে কোন সম্পত্তির মালিকানা কল্পনাও করা যায় না। একজন শ্রমিকের অবস্থা এই যে, সে কোন কিছুর মালিক নয়। তার সন্তান ও স্ত্রীও তার নিজের নয়; বরং সবই রাষ্ট্ররূপী মেশিনের কল-কব্জা। মেশিন চালু হওয়ার সাথে সাথে এদের কাজে লেগে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কল্পিত রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছাড়া তার না আছে কোন বিবেক আর না আছে কোন বাকস্বাধীনতা। রাষ্ট্রযন্ত্রের জোর-জুলুম ও অসহনীয় পরিশ্রমে কাতর হয়ে উহঃ আহঃ করাও প্রাণদণ্ডযোগ্য বিদ্রোহ বলে পরিগণিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা ও ধর্মের বিরোধিতা এবং খাঁটি জড়বাদী ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তিস্তম্ভ।

কোন সমাজতন্ত্রী এসব সত্য অস্বীকার করতে পারবে না। সমাজতন্ত্রের কর্ণ-ধারদের গ্রন্থাবলী এবং আমলনামা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তাদের এসব বরাত একত্রিত করার জন্য একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন হবে।

কোরআন পাক উৎপীড়নমূলক পুঁজিবাদ এবং নির্বোধসুলভ সমাজতন্ত্রের মাঝা-মাঝি, স্বল্পতা ও বহুল্য বিবর্জিত একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রদান করেছে। এতে রিযিক ও অর্থ-সম্পদের প্রাকৃতিক পার্থক্য সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী সাধারণ জনগণকে গোলামে পরিণত করতে পারে না এবং কৃত্রিম দুর্মূল্য ও দুর্ভিক্ষে নিক্ষেপ করতে পারে না। সুদ ও জুয়াকে হারাম সাব্যস্ত করে অবৈধ পুঁজি সঞ্চয়ের ভিত্তি ভূমিস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর প্রত্যেক মুসলমানের ধনসম্পদে দরিদ্রদের প্রাপ্য নির্ধারিত করে তাদেরকে তাতে অংশীদার করা হয়েছে। এটা দরিদ্রদের প্রতি দয়া নয়, বরং কর্তব্য সম্পা-দন মাত্র। فِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ — আয়াতটি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির ধনসম্পত্তি পরিবারের লোকজনের মাঝে বন্টন করে সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়ার মূলোৎপাটন করা হয়েছে। প্রাকৃতিক নদ-নদী, সমুদ্র, পাহাড় ও বন-জঙ্গলের নিজে নিজে গজিয়ে ওঠা সম্পদকে সমগ্র জাতির যৌথ সম্পত্তি সাব্যস্ত করা হয়েছে। এগুলোতে কোন ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর মালিকসুলভ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা

বৈধ নয়। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এসব বস্তুর উপর পুঁজিপতিদের মালিকানা স্বীকার করা হয়।

জ্ঞানগত ও কর্মগত যোগ্যতার বিভিন্নতা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার এবং জীবিকা উপার্জন এসব যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। তাই ধনসম্পদের মালিকানার বিভিন্নতাও যথার্থ তাৎপর্যের তাকাদা। সামান্যতম জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তিও একথা অস্বীকার করতে পারে না। সাম্যের ধ্বজাধারীরাও কয়েক পা এগুতে না এগুতেই সাম্যের দাবী পরিত্যাগ করতে এবং জীবিকায় তারতম্য ও পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়েছে।

তদানীন্তন রুশ প্রধানমন্ত্রী ১৯৬০ সনের ৫ই মে তারিখে সুপ্রীম সোভিয়েটের সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিল ঃ

"আমরা মজুরির পার্থক্য বিলুপ্ত করার আন্দোলনের ঘোর বিরোধী। আমরা মজুরির ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করার এবং সবার মজুরি এক পর্যায়ে আনার প্রকাশ্যে বিরোধিতা করি। এটা লেনিনের শিক্ষা। তার শিক্ষা ছিল এই যে, সমাজে সমাজবাদী বৈষয়িক কারণাদির প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রাখা হবে।"---(সোভিয়েট ---ওয়ার্ল্ড, ৩৪৬ পৃঃ)

অর্থনৈতিক সাম্যের বাস্তবায়ন যে অসাম্যের মাধ্যমে হয়েছিল, তা প্রথম থেকেই সবার চোখে ধরা পড়েছিল। কিন্তু দেখতে দেখতে এ অসাম্য এবং ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়াতে সাধারণ পুঁজিবাদী দেশের চাইতেও অধিক প্রকট হয়ে পড়ে।

লিউন শিডো লিখেন ঃ

"এমন কোন উন্নয়নশীল পুঁজিবাদী দেশ থাকলে থাকতেও পারে, যেখানে রাশিয়ার ন্যায় মজুরিতে বিরাট ব্যবধান রয়েছে।"

উল্লিখিত কয়েকটি বাস্তব উদাহরণ অবিশ্বাসীদের মুখে وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ আয়াতের সত্যায়ন তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও করিয়ে দিয়েছে। وَاللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ----আলোচ্য আয়াতের অধীনে এখানে এতটুকু বলাই উদ্দেশ্য ছিল যে, ধনসম্পদে তারতম্য হওয়া একটি স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক এবং মানবিক উপকারিতার সাথে সঙ্গতিশীল ব্যাপার। অতঃপর সম্পদ বন্টনে ইসলামী মূলনীতি এবং পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের সাথে তার পার্থক্য ইনশাল্লাহ্ সূরা যুখরুফের نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হবে।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ
بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ
وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا
لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٧٣﴾
فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٧٤﴾
ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ
مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا ۚ هَلْ يَسْتَوٗنَ ۚ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾ وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ
اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ
اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ۭ هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ وَمَنْ يَّاْمُرُ
بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٧٦﴾

(৭২) আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য তোমাদেরই শ্রেণী থেকে জোড়া পয়দা করেছেন এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদেরকে পুত্র ও পৌত্রাদি দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন। অতএব তারা কি মিথ্যা বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করে? (৭৩) তারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন বস্তুর ইবাদত করে, যে তাদের জন্যে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল থেকে সামান্য রুযী দেওয়ারও অধিকার রাখে না এবং শক্তিও রাখে না। (৭৪) অতএব আল্লাহ্‌র কোন সদৃশ সাব্যস্ত করো না, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ জানেন এবং তোমরা জান না। (৭৫) আল্লাহ্‌ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, অপরের মালিকানাধীন গোলামের, যে কোন কিছুর ওপর শক্তি রাখে না এবং এমন একজন যাকে আমি নিজের পক্ষ থেকে চমৎকার রুযী দিয়েছি। অতএব সে তা থেকে ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে। উভয়ে কি সমান হয়? সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র কিন্তু অনেক মানুষ জানে না। (৭৬) আল্লাহ্‌ আরেকটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, দু'ব্যক্তির একজন বোবা কোন কাজ করতে পারে না। সে মালিকের ওপর বোঝা। যে দিকে তাকে পাঠায়, কোন সঠিক কাজ করে আসে না। সে কি সমান হবে ঐ ব্যক্তির, যে ন্যায়বিচারের আদেশ করে এবং সরল পথে কায়েম রয়েছে?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (কুদরতের প্রমাণাদি ও বিভিন্ন প্রকার নিয়ামতের মধ্য থেকে একটি বড় নিয়ামত ও আল্লাহ্‌র কুদরতের প্রমাণ হচ্ছে স্বয়ং তোমাদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব যে,) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরই মধ্য থেকে (অর্থাৎ তোমাদের জাতি ও শ্রেণী থেকে) তোমাদের জন্য স্ত্রী তৈরী করেছেন এবং (অতঃপর) স্ত্রীদের থেকে তোমাদের পুত্র ও পৌত্র পয়দা করেছেন (কারণ, এটা হচ্ছে তোমাদের শ্রেণীগত স্থায়িত্ব) এবং তোমাদেরকে ভাল ভাল বস্তু খেতে (ও পান করতে) দিয়েছেন। (এটা ব্যক্তিগত স্থায়িত্ব। যেহেতু স্থায়িত্ব অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল, তাই এতে অস্তিত্বের প্রতিও ইঙ্গিত হয়ে গেছে।) তারা কি (এসব প্রমাণ ও নিয়ামত সম্পর্কে শুনে) তবুও অমূলক বিষয়ের প্রতি (অর্থাৎ প্রতিমা ইত্যাদির প্রতি, যাদের উপাস্য হওয়ার কোন প্রমাণ নেই, বরং না হওয়ারই প্রমাণ রয়েছে ---) ঈমান রাখবে এবং আল্লাহ্‌র নিয়ামতের না-শোকরী (তথা অবমূল্যায়ন) করতে থাকবে? এবং (এই না-শোকরীর অর্থ এই যে,) আল্লাহ্‌কে ছেড়ে এমন বস্তুসমূহের ইবাদত করতে থাকবে, যারা তাদেরকে না আসমান থেকে রুযী পৌঁছানোর ক্ষমতা রাখে, আর না যমিন থেকে। (অর্থাৎ না তারা বৃষ্টি বর্ষণের ক্ষমতা রাখে এবং না মাটি থেকে কিছু পয়দা করার) এবং তারা (ক্ষমতা লাভেরও) শক্তি রাখে না। (এই না বোধক বাক্য দ্বারা বিষয়-বস্তু আরও জোরদার হয়ে গেছে। কেননা, মাঝে মাঝে দেখা যায়, এক ব্যক্তি কার্যত ক্ষমতাশালী নয়, কিন্তু চেষ্টাচরিত্র করে শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা অর্জন করে নেয়। এজন্য এ বিষয়টিও 'না' করে দেওয়া হয়েছে।) অতএব (যখন শিরকের অসারতা প্রমাণিত হয়ে গেল, তখন) তোমরা আল্লাহ্‌র কোন সদৃশ তৈরী করো না (যে, আল্লাহ্ হচ্ছেন জাগতিক রাজা-বাদশাহ্‌দের মত। প্রত্যেকেই তাঁর কাছে আবেদন নিবেদন করতে পারে না। এজন্য তাঁর প্রতিনিধি রয়েছেন। জনগণ তাদের কাছে আবেদন-নিবেদন করবে। এরপর তারা বাদশাহ্‌র কাছে আবেদন-নিবেদন পেশ করবে। এরূপ তফসীরে কবীরে বলা হয়েছে (ويؤخذ من قوله ما نعبدهم الا ليقربونا وهؤلاء شفعاء نا عند الله) আল্লাহ্ তা'আলা (খুব জানেন যে, এসব দৃষ্টান্ত অনর্থক) এবং তোমরা (অবিবেচনার কারণে) জান না। (তাই মুখে যা আসে, তাই বলে ফেল এবং) আল্লাহ্ তা'আলা (শিরকের অসারতা প্রকাশ করার জন্য) একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, (মনে কর) এক হচ্ছে গোলাম (কারও) মালিকানাধীন (অর্থকরি ও ব্যবহারাদির মধ্য থেকে) কোন বস্তুর (মালিকের অনুমতি ব্যতীত) ক্ষমতা রাখে না এবং (দ্বিতীয়) এক ব্যক্তি, যাকে আমি নিজের পক্ষ থেকে ঢের রুযী দিয়েছি। সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে (যেভাবে চায়, যেখানে চায়) ব্যয় করে (তাকে বাধাদানকারী কেউ নেই)। এ ধরনের ব্যক্তিরা কি পরস্পর সমান হতে পারে? যখন কৃত্রিম মালিক ও কৃত্রিম গোলাম সমান হতে পারে না, তখন সত্যিকার মালিক ও সত্যিকার গোলাম কেমন করে সমান হতে পারে? (ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতা সমান হওয়ার উপর নির্ভরশীল। তা নেই।) সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্যই উপযুক্ত। (কেননা, পূর্ণাঙ্গ সত্তা ও গুণাবলীর অধিকারী তিনিই। তাই উপাস্যও তিনিই হতে পারেন, কিন্তু মুশরিকরা এরপরও অন্যের ইবাদত ত্যাগ করে না।) বরং তাদের অধিকাংশ (অবিবেচনার কারণে

তা) জানেই না। (না জানার কারণ যেহেতু স্বয়ং তাদের অবিবেচনা, তাই তাদের ক্ষমা হবে না।) আল্লাহ্ তা'আলা (এর ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে) আরও একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, (মনে কর---) দু'ব্যক্তি রয়েছে। তাদের একজন তো (গোলাম হওয়া ছাড়া) বোবা, (ও কালা। আর কালা, অন্ধ ও নির্বোধ হওয়ার কারণে) কোন কাজ করতে পারে না, এবং (এ কারণে) সে মালিকের গলগ্রহ। (কারণ, মালিকই তার সব কাজ করে এবং) সে (অর্থাৎ মালিক) তাকে যেখানে পাঠায়, কোন সঠিক কাজ করে আসে না। (অতএব) এ ব্যক্তি এবং সে ব্যক্তি কি পরস্পর সমান হতে পারে, যে ভাল কথা শিক্ষা দেয় (যদ্দ্বারা তার বাক, বুদ্ধি ও জ্ঞানবান হওয়া বোঝা যায়) এবং নিজেও (প্রত্যেক কাজে) সুষম পথে (ধাবমান) থাকে, (যদ্দ্বারা সুশৃংখল কর্মশক্তি জানা যায়। সত্তা ও গুণাবলীতে অভিন্নতা সত্ত্বেও যখন মানুষে মানুষে এমন পার্থক্য তখন মানুষ ও স্রষ্টার মধ্যে কতটুকু পার্থক্য হতে পারে? পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে لا يقدر বাক্যের তরজমায় 'মালিকের অনুমতি ব্যতীত' কথাটি যুক্ত করায় ফিকাহ্ সংক্রান্ত প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেছে। আর কেউ যেন এরূপ ধারণায় লিপ্ত না হয় যে, সম্ভবত আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্যকেও অনুমতি দেওয়া হয়েছে। জওয়াব এই যে, প্রতিপালকত্বের জন্য কাউকে অনুমতি দেওয়া হয়নি এবং তা সম্ভবও নয়।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا----আয়াতে একটি প্রধান নিয়ামত বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরই স্বজাতি থেকে তোমাদের স্ত্রী নির্ধারণ করেছেন, যাতে পরস্পর ভালবাসাও পূর্ণরূপে হয় এবং মানব জাতির আভিজাত্য এবং মাহাত্ম্যও অব্যাহত থাকে।

وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً----অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীদের থেকে তোমাদের পুত্র ও পৌত্র পয়দা করেছেন।

এখানে প্রণিধানযোগ্য এই যে, সন্তান-সন্ততি পিতামাতা উভয়ের সহযোগে জন্মগ্রহণ করে। আলোচ্য আয়াতে তা শুধু জননী থেকে পয়দা করার কথা বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সন্তান প্রসব ও সন্তান প্রজননে পিতার তুলনায় মাতার দখল বেশি। পিতা থেকে শুধু নিষ্প্রাণ একটি বীর্যবিন্দু নির্গত হয়। এ বিন্দুর উপর দিয়ে বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রান্ত হয়ে মানবাকৃতিতে পরিণত হওয়া, তাতে প্রাণ সঞ্চার হওয়া, সর্বশক্তি-মানের এসব সৃষ্টিজনিত ক্রিয়াকর্মের স্থান মাতার উদরেই। এ জন্যই হাদীসে মাতার হককে পিতার হক থেকে অগ্রে রাখা হয়েছে।

এ বাক্যে পুত্রদের সাথে পৌত্রদের কথা উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এ দম্পতি সৃষ্টির আসল লক্ষ্য হচ্ছে মানব বংশের স্থায়িত্ব, যাতে সন্তান ও সন্তানের সন্তান হয়ে মানব জাতির স্থায়িত্বের ব্যবস্থা হয়।

অতঃপর وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ---বলে মানুষের ব্যক্তিগত স্থায়িত্বের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জন্মের পর মানুষের ব্যক্তিগত স্থায়িত্বের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাও সরবরাহ করছেন। আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের আসল অর্থ সাহায্যকারী, সেবক। সন্তানদের জন্যে এ শব্দটি ব্যবহার করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, পিতামাতার সেবক হওয়া সন্তানের কর্তব্য। ---(কুরতুবী)

فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ---বাক্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ সত্যের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনই কাফিরসুলভ সন্দেহ ও প্রশ্নের জন্ম দেয়। সত্যটি এই যে, সাধারণভাবে মানুষ আল্লাহ্ তা'আলাকে মানবজাতির অনুরূপ মনে করে তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, যেমন রাজা-বাদশাহ্কে আল্লাহ্র সদৃশরূপে পেশ করে। অতঃপর এই ভ্রান্ত দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে আল্লাহ্র কুদরতের ব্যবস্থাকেও রাজা-বাদশাহ্দের ব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে বলতে থাকে যে, কোন রাষ্ট্রে একা বাদশাহ যেমন সমগ্র দেশের আইন-শৃংখলা পরিচালনা করতে পারেন না, অধীনস্থ মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদেরকে ক্ষমতা অর্পণ করে তাদের সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করতে হয়, তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলার অধীনে আরও কিছুসংখ্যক উপাস্যও থাকা প্রয়োজন, যারা আল্লাহ্র কাজে তাঁকে সাহায্য করবে। মূর্তি পূজারী ও মুশরিকদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা তাই। আলোচ্য বাক্যটি তাদের সন্দেহের মূল কেটে দিয়ে বলেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার জন্য সৃষ্টজীবের দৃষ্টান্ত পেশ করা একান্তই নির্বুদ্ধিতা। তিনি দৃষ্টান্ত, উদাহরণ এবং আমাদের ধারণা-কল্পনার অনেক উর্ধ্বে।

শেষের দু'আয়াতে মানুষের দু'টি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। প্রথম আয়াতে প্রভু ও গোলাম অর্থাৎ মালিক ও মালিকানাধীনের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে যে, তারা উভয়েই যখন একই জাতি ও একই শ্রেণীভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সমান হতে পারে না, তখন কোন সৃষ্টজীবকে আল্লাহ্র সমান কিরূপে সাব্যস্ত কর ?

দ্বিতীয় উদাহরণে একদিকে এমন লোক রয়েছে, যে লোকদেরকে ন্যায়, সুবিচার ও ভাল কথা শিক্ষা দেয়। এটা তার জ্ঞানশক্তির পরাকাষ্ঠা। সে নিজেও সুষম ও সরল পথে চলে। এটা তার কর্মশক্তির পরাকাষ্ঠা। এহেন কর্মগত ও জ্ঞানগত পরাকাষ্ঠার অধিকারী ব্যক্তির বিপরীতে এমন একজন লোক রয়েছে, যে নিজের কাজ করতে সক্ষম নয় এবং অন্যের কাজও ঠিকমত করতে পারে না। এই উভয় প্রকার মানুষ একই জাতি, একই শ্রেণী এবং একই সমাজভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পরস্পর সমান হতে পারে না। অতএব সৃষ্ট জগতের স্রষ্টা ও প্রভু যিনি সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান, তাঁর সাথে কোন সৃষ্টবস্তু কিরূপে সমান হতে পারে।

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ
الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٧٧﴾ وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ
مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ
الْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٨﴾ اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ
مُسَخَّرٰتٍ فِىْ جَوِّ السَّمَآءِ ؕ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ
لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٧٩﴾ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ
لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ
اِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَآ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا
اِلٰى حِيْنٍ ﴿٨٠﴾ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ
الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ
تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ﴿٨١﴾
فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٨٢﴾ يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ
ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٣﴾ ع

(৭৭) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপন রহস্য আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে। কিয়ামতের ব্যাপারটি তো এমন, যেমন চোখের পলক অথবা তার চাইতেও নিকটবর্তী। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছুর ওপর শক্তিমান। (৭৮) আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন। তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর। (৭৯) তারা কি উড়ন্ত পাখীকে দেখে না? এগুলো আকাশের অন্তরীক্ষে আজ্ঞাধীন রয়েছে। আল্লাহ্ ছাড়া কেউ এগুলোকে আগলে রাখে না। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসীদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৮০) আল্লাহ্ করে দিয়েছেন তোমাদের গৃহকে অবস্থানের জায়গা এবং চতুষ্পদ জন্তুর চামড়া দ্বারা করেছেন তোমার জন্য তাঁবুর ব্যবস্থা। তোমরা এগুলোকে সফরকালে ও অবস্থানকালে হালকা পাও। ভেড়ার পশম, উটের বাবরি চুল ও ছাগলের লোম দ্বারা কত আসবাবপত্র ও

ব্যবহারের সামগ্রী তৈরী করেছেন এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। (৮১) আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে সৃজিত বস্তু দ্বারা ছায়া করে দিয়েছেন এবং পাহাড়সমূহে তোমাদের জন্যে আত্মগোপনের জায়গা করেছেন এবং তোমাদের জন্যে পোশাক তৈরী করে দিয়েছেন, যা তোমাদেরকে গ্রীষ্ম এবং বিপদের সময় রক্ষা করে। এমনিভাবে তিনি তোমাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহের পূর্ণতা দান করেন, যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর। (৮২) অতঃপর যদি তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তবে আপনার কাজ সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া মাত্র। (৮৩) তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ চিনে, এরপর অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোপন রহস্য (যা কেউ জানে না; জানার দিক দিয়ে) আল্লাহ্ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য (অতএব জ্ঞানগুণে তিনি পরিপূর্ণ) এবং (শক্তিতে এমন পরিপূর্ণ যে, এসব গোপন রহস্যের মধ্যে যে একটা বিরাট কাজ রয়েছে অর্থাৎ) কিয়ামতের কাজ (তা) এমন (ত্বরিত গতিতের সম্পন্ন) হবে, যেমন চোখের পলক, বরং তার চাইতেও দ্রুত। (কিয়ামতের কাজের অর্থ মৃতদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হওয়া। এটা যে চোখের পলকের চাইতেও দ্রুত হবে, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কেননা, চোখের পলক একটি গতি। গতি কালের অধীন। কিন্তু প্রাণ সঞ্চারিত হওয়া মুহূর্তের ব্যাপার। মুহূর্ত কালের চাইতে দ্রুত। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ) নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। (ক্ষমতা প্রমাণ করার জন্য বিশেষভাবে কিয়ামত উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, কিয়ামত বিশেষ শ্রেণীর গোপন রহস্যেরও অন্যতম। তাই এটি জ্ঞান ও ক্ষমতার উভয়ের প্রমাণ---সংঘটিত হওয়ার পূর্বে জ্ঞানের এবং সংঘটিত হওয়ার পর ক্ষমতার প্রমাণ।) এবং (কুদরত ও বিভিন্ন নিয়ামতের প্রমাণাদির মধ্যে একটি এই যে,) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে এমতাবস্থায় বের করেছেন যে, তোমরা কিছুই জানতে না (দার্শনিকদের পরিভাষায় এই স্তরের নাম 'আকলে হাইউলানী' তথা জড় জ্ঞান) এবং তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা শোকর কর। (কুদরত সপ্রমাণ করার জন্যে) তারা কি পক্ষীসমূহকে দেখে না যে, আসমানের (নিচে) অন্তরীক্ষে (কুদরতের) আজ্ঞাধীন হয়ে আছে, (অর্থাৎ) তাদেরকে (সেখানে) কেউ আগলে রাখে না, আল্লাহ্ ছাড়া। (নতুবা তাদের দেহের ঘনত্ব এবং বাতাসের বায়বীয়তার কারণে নিচে পড়ে যাওয়াই সঙ্গত ছিল। তাই উল্লিখিত বিষয়ে) ঈমানদারদের জন্য (আল্লাহ্র কুদরতে) কতিপয় প্রমাণ (বিদ্যমান) রয়েছে। (কতিপয় প্রমাণ বলার কারণ এই যে, পাখীদেরকে বিশেষ আকারে সৃষ্টি করা, যাতে উড়তে পারে, একটি প্রমাণ। অতঃপর শূন্যমার্গকে উড়ার উপযোগী ও সম্ভবপর করে সৃষ্টি করা দ্বিতীয় প্রমাণ এবং কার্যত উড়া সংঘটিত হওয়া তৃতীয় প্রমাণ। উড়ার মধ্যে যেসব কারণের দখল রয়েছে, সেগুলো আল্লাহ্ তা'আলারই সৃজিত। এরপর এসব কারণের ভিত্তিতে উড়া বিদ্যমান হয়ে যাওয়াও আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা। নতুবা প্রায়ই কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ঘটনা অস্তিত্বলাভ করে না। তাই

مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الخ বলা হয়েছে। বিভিন্ন নিয়ামত ও কুদরতের প্রমাণাদির মধ্যে একটি এই যে) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য (গৃহে অবস্থান কালে) তোমাদের গৃহে বসবাসের জায়গা করেছেন এবং (সফর অবস্থায়) তোমাদের জন্য জন্তুদের চামড়ার ঘর (অর্থাৎ তাঁবু তৈরী করেছেন, সেগুলোকে তোমরা সফর কালে এবং গৃহে অবস্থান কালে) হালকা পাও। (তাই একে বহন করা এবং স্থাপন করা সহজ মনে হয়)। এবং তাদের (জন্তুদের) পশম, তাদের লোম এবং তাদের কেশ (তোমাদের) গৃহের আসবাবপত্র এবং কাজের জিনিস এক সময়ের জন্য তৈরী করেছেন ('এক সময়ের জন্য' বলার কারণ এই যে, এসব আসবাবপত্র সুতার কাপড়ের তুলনায় অধিক টেকসই হয়। বিভিন্ন নিয়ামত ও কুদরতের প্রমাণাদির মধ্যে একটি এই যে) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য সৃজিত বস্তুর ছায়া করে দিয়েছেন (যেমন বৃক্ষ, ঘর-দরজা ইত্যাদি) এবং তোমাদের জন্য পাহাড়সমূহে আশ্রয়স্থল করেছেন (অর্থাৎ গুহা ইত্যাদি, যেগুলোতে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষায়, ইতর প্রাণী---মানুষ ও জন্তু শত্রু থেকে নিরাপদে থাকতে পারে।) এবং তোমাদের জন্য এমন জামা তৈরী করেছেন, যা গ্রীষ্ম থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করে এবং এমন জামা (-ও) তৈরী করেছেন, যা তোমাদেরকে পারস্পরিক যুদ্ধ থেকে (অর্থাৎ যুদ্ধে জখম লাগা থেকে) রক্ষা করে। (এখানে লৌহবর্ম বোঝানো হয়েছে। 'আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি এ ধরনের নিয়ামতসমূহ পূর্ণ করেন, যাতে তোমরা (এসব নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ) অনুগত থাক। (উল্লিখিত নিয়ামতসমূহের মধ্যে কিছুসংখ্যক মানব নির্মিতও রয়েছে। কিন্তু সেগুলোর মূল উপকরণ এবং নির্মাণ-কৌশল আল্লাহ্ তা'আলারই সৃজিত। তাই প্রকৃত নিয়ামতদাতা তিনিই। অতঃপর এসব নিয়ামতের পরও) যদি তারা ঈমান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, (তবে আপনি দুঃখিত হবেন না---এতে আপনার কোন ক্ষতি নেই। কেননা) আপনার দায়িত্ব শুধু সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া। তাদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণ এটা নয় যে, তারা এসব নিয়ামত চেনে না; (বরং তারা) আল্লাহ্‌র নিয়ামত চেনে, কিন্তু চেনার পর (ব্যবহারে) তা অস্বীকার করে (অর্থাৎ নিয়ামতদাতার সাথে যেরূপ ব্যবহার করা উচিত ছিল, অর্থাৎ ইবাদত ও আনুগত্য--তা অন্যের সাথে করে) এবং তাদের অধিকাংশ এমনি অকৃতজ্ঞ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জ্ঞান লাভ মানুষের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য নয়। জন্মের সময় তার কোন জ্ঞান ও নৈপুণ্য থাকে না। অতঃপর মানবিক প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে কিছু কিছু জ্ঞান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সরাসরি শিক্ষা দেওয়া হয়। এসব জ্ঞান শিক্ষায় পিতামাতা ও ওস্তাদের কোন ভূমিকা নেই। সর্বপ্রথম তাকে কান্না শিক্ষা দেওয়া হয়। তার এ গুণটিই তখন তার যাবতীয় অভাব মেটায়। ক্ষুধা বা তৃষ্ণা পেলে সে কান্না জুড়ে দেয়, শীত-উত্তাপ লাগলে কান্না জুড়ে দেয়। অনুরূপ অন্য যে কোন কষ্ট অনুভব করলেই

কান্না জুড়ে দেয়। সর্বশক্তিমান তার অভাব মেটানোর জন্য পিতামাতার অন্তরে বিশেষ স্নেহ-মমতা সৃষ্টি করে দেন। শিশুর আওয়াজ শুনতেই তাঁরা তার কষ্ট বুঝতে ও তা দূর করতে সচেষ্ট হয়ে যায়। যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শিশুকে এ কান্না শিক্ষা দেওয়া না হত, তবে কে তাকে শিক্ষা দিত যে, কোন অসুবিধা দেখা দিলেই এভাবে শব্দ করতে হবে? এর সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ইলহামের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন যে, মায়ের স্তন থেকে খাদ্যলাভ করার জন্য মাড়ি ও ঠোঁটকে কাজে লাগাতে হবে। এ শিক্ষা স্বভাবত ও সরাসরি না হলে কোন্ ওস্তাদের সাধ্য ছিল এ সদ্যজাত শিশুকে মুখ চালনা ও স্তন চোষা শিক্ষা দেওয়া! এমনিভাবে তার প্রয়োজন যতই বাড়তে থাকে, সর্বশক্তিমান তাকে পিতামাতার মধ্যস্থতা ছাড়াই আপনা-আপনি শিক্ষাদান করেন। কিছুদিন পর তার মধ্যে এমন নৈপুণ্য সৃষ্টি হতে থাকে যে, পিতামাতা ও নিকটস্থ অন্যান্য লোকের কথাবার্তা শুনে কিংবা কোন কোন বস্তু দেখে কিছু শিখতে থাকে। অতঃপর শ্রুত শব্দ ও দেখা বিষয় নিয়ে চিন্তা করার ও বোঝার নৈপুণ্য সৃষ্টি হয়।

তাই আয়াতে لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا-এর পরে বলা হয়েছে ঃ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ---অর্থাৎ জন্মের শুরুতে যদিও কোন কিছুর জ্ঞান মানুষের মধ্যে ছিল না, কিন্তু সর্বশক্তিমান তার অস্তিত্বের মধ্যে জ্ঞান অর্জনের অভিনব উপকরণ স্থাপন করে দিয়েছেন। এসব উপকরণের মধ্যে সর্বপ্রথম سمع অর্থাৎ শ্রবণ-শক্তির উল্লেখ করা হয়েছে। একে অগ্রে আনার কারণ সম্ভবত এই যে, মানুষের সর্বপ্রথম জ্ঞান এবং সর্বাধিক জ্ঞান কানের পথেই আগমন করে। সূচনাভাগে চক্ষু বন্ধ থাকে; কিন্তু কান শ্রবণ করে। এরপরও চিন্তা করলে দেখা যায় যে, মানুষ সারা জীবনে যত জ্ঞান অর্জন করে, তন্মধ্যে কানে শ্রুত জ্ঞান সর্বাধিক। চোখে দেখা জ্ঞান তুলনামূলকভাবে কম।

এতদুভয়ের পর ঐসব জ্ঞানের পালা আসে, যেগুলো মানুষ শোনা ও দেখা বিষয়সমূহ নিয়ে চিন্তাভাবনা করে অর্জন করে। কোরআনের উক্তি অনুযায়ী একাজ মানুষের অন্তরের। তাই তৃতীয় পর্যায়ে أَفْئِدَةً বলা হয়েছে। এটা فُؤَادٌ-এর বহুবচন। অর্থ অন্তর।

দার্শনিকরা সাধারণভাবে মানুষের মস্তিষ্ককে জ্ঞানবুদ্ধি ও বোধশক্তির কেন্দ্র সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু কোরআনের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, কোন কিছু বোঝার ব্যাপারে যদিও মস্তিষ্কের প্রভাব রয়েছে, কিন্তু জ্ঞানবুদ্ধির আসল কেন্দ্র হচ্ছে অন্তর।

এ স্থলে আল্লাহ্ তা'আলা শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি ও বোধশক্তির উল্লেখ করেছেন; বাকশক্তি ও জিহ্বার কথা উল্লেখ করেন নি। কেননা, জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে বাকশক্তির প্রভাব নেই; বাকশক্তি বরং জ্ঞান প্রকাশের উপায়। এছাড়া ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ শ্রবণশক্তির সাথে বাকশক্তির উল্লেখও প্রসঙ্গত হয়ে গেছে। কেননা, অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয়, যে ব্যক্তি কানে শোনে, সে মুখে কথাও বলে। বোবা কথা বলতে অক্ষম, সে কানের দিক থেকেও বধির। সম্ভবত তার কথা না বলার কারণই হচ্ছে কানে কোন শব্দ না শোনা। শব্দ শুনলে হয়তো সে তা অনুসরণ করে বলাও শিখত।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا—এখানে بيوت শব্দটি بيت

-এর বহুবচন। রাত্রিযাপন করা যায় এমন গৃহকে بيت বলা হয়। ইমাম কুরতুবী স্বীয় তফসীরে বলেন ঃ

كل ما علاك فا ظلك فهو سقف وسماء وكل ما اقلك فهو ارض وكل ما ستر ك من جها تك الا ربع فهو جدار فاذا انتظمت واتصلت فهو بيت -

অর্থাৎ "যে বস্তু তোমার মাথার উপরে রয়েছে এবং তোমাকে ছায়া দান করে, তা ছাদ ও আকাশ বলে কথিত হয়। যে বস্তু তোমার অস্তিত্বকে বহন করছে তা যমীন এবং যে বস্তু চতুর্দিক থেকে তোমাকে আবৃত করে রাখে, তা প্রাচীর। এগুলো সব কাছাকাছি একত্রিত হয়ে গেলে তাই بيت তথা গৃহে পরিণত হয়।"

গৃহ নির্মাণের আসল লক্ষ্য অন্তর ও দেহের শান্তি ঃ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মানবগৃহকে শান্তির জায়গা বলে অভিহিত করে গৃহ নির্মাণের দর্শন ও রহস্য ফুটিয়ে তুলেছেন। অর্থাৎ এর আসল লক্ষ্য হচ্ছে দেহ ও অন্তরের শান্তি। মানুষ অভ্যাসগতভাবে গৃহের বাইরে পরিশ্রমলব্ধ উপার্জন ও কাজকর্ম করে। তখন পরিশ্রান্ত হয়ে গৃহে পৌঁছে বিশ্রাম ও শান্তি অর্জন করাই গৃহের আসল উদ্দেশ্য। যদিও মাঝে মাঝে মানুষ গৃহেও কাজকর্মে মশগুল থাকে, কিন্তু এটা সাধারণত খুব কমই হয়।

এ ছাড়া আসল শান্তি হচ্ছে মন ও মস্তিষ্কের শান্তি। এটা মানুষ গৃহের মধ্যেই পায়। এ থেকে আরও জানা গেল যে, গৃহের প্রধান গুণ হচ্ছে তাতে শান্তি পাওয়া। বর্তমান বিশ্বের গৃহনির্মাণ কাজ চরম উন্নতির পথে রয়েছে। এতে বাহ্যিক সাজ-সজ্জার জন্য বেহিসাব খরচও করা হয়, কিন্তু দেহ ও মনের শান্তি পাওয়া যায়, এরূপ গৃহের সংখ্যা খুবই কম। কোন কোন ক্ষেত্রে বরং কৃত্রিম লৌকিকতাই আরাম ও শান্তির মূলে কুঠারাঘাত হানে। এটা না হলে গৃহে যাদের সাথে ওঠাবসা করতে হয়, তারা শান্তি বরবাদ করে দেয়। এহেন সুরম্য অট্টালিকার চাইতে এমন কুড়েঘরও উত্তম, যার বাসিন্দারা দেহ ও মনের শান্তি পায়।

কোরআন পাক প্রত্যেক বস্তুর প্রাণ ও মূল বর্ণনা করে। শান্তিকে মানব গৃহের প্রকৃত লক্ষ্য এবং সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। এমনিভাবে কোরআন দাম্পত্য জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যও শান্তি সাব্যস্ত করে বলেছে ঃ لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا—অর্থাৎ "তোমরা যেন তার নিকট গিয়ে শান্তি লাভ করতে পার।" যে দাম্পত্য জীবন থেকে এ লক্ষ্য অর্জিত হয় না, তা প্রকৃত উপকারিতা থেকে বঞ্চিত। সাম্প্রতিক বিশ্বে এসব বিষয়ে আনুষ্ঠানিকতা ও অনানুষ্ঠানিক লৌকিকতা এবং বাহ্যিক সাজ-সজ্জার অন্ত নেই এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা এসব বিষয়ে বাহ্যিক সাজ-সজ্জার যাবতীয় উপকরণ উপস্থিত করে দিয়েছে, কিন্তু দেহ ও মনের শান্তি সম্পূর্ণরূপে ছিনিয়ে নিয়েছে।

مِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا এবং مِنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ থেকে প্রমাণিত হল যে, জীব-জন্তুর চামড়া, লোম ও পশম ব্যবহার করা মানুষের জন্য হালাল। এতে জন্তুটি যবেহকৃত হওয়া অথবা মৃত হওয়ারও কোন শর্ত নেই। এমনিভাবে যে জন্তুর পশম বা চামড়া আহরণ করা হবে, সেটির গোশত হালাল কি হারাম সেটা বিচার করারও কোন শর্ত নেই। সব রকম জন্তুর চামড়াই লবণ দিয়ে শুকানোর পর ব্যবহার করা হালাল। লোম ও পশমের উপর জন্তুর মৃত্যুর কোন প্রভাবই পড়ে না। তাই সেটি যথারীতি শুকিয়ে ব্যবহারোপযোগী করে নিলেই তা পাক হয়ে যায় এবং সেটি ব্যবহার করা হালাল ও জায়েয হয়ে যায়। ইমাম আযম আবূ হানিফা (র)-র মযহাব তাই। তবে শূকরের চামড়া ও যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও লোম-পশম অপবিত্র ও ব্যবহারের অযোগ্য।

سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ——এখানে গ্রীষ্মের উত্তাপ থেকে রক্ষা করাকে মানুষের জামার উদ্দেশ্য বলা হয়েছে। অথচ জামা মানুষকে শীত ও গ্রীষ্ম উভয় ঋতুর প্রভাব থেকেই রক্ষা করে। ইমাম কুরতুবী ও অন্যান্য তফসীরবিদের এ প্রশ্নের জওয়াবে বলেন যে, কোরআন পাক আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। সর্বপ্রথম এতে আরবদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাই এতে আরবদের অভ্যাস ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বক্তব্য রাখা হয়েছে। আরব গ্রীষ্ম প্রধান দেশ। সেখানে বরফ জমা ও শীতের কল্পনা করা কঠিন। তাই শুধু গ্রীষ্ম থেকে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। হযরত থানভী (র) বয়ানুল কোরআনে বলেন ঃ কোরআন পাক এ সূরার শুরুতে لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ বলে পোশাকের সাহায্যে শীত থেকে আত্মরক্ষা ও উত্তাপ হাসিল করার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছিল। তাই এখানে শুধু উত্তাপ প্রতিহত করার কথা বলা হয়েছে।

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا
وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٨٤﴾ وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ
عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٨٥﴾ وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا شُرَكَآءَهُمْ
قَالُوْا رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ ۚ
فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٨٦﴾ وَاَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذِ ۨ
السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٨٧﴾ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا

عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا
يُفْسِدُوْنَ ۝ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ
اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ ۭ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ
تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ۝

(৮৪) যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন বর্ণনাকারী দাঁড় করাব, তখন কাফিরদেরকে অনুমতি দেওয়া হবে না এবং তাদের কাছ থেকে তওবাও গ্রহণ করা হবে না। (৮৫) যখন জালিমরা আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন তাদের থেকে তা লঘু করা হবে না এবং তাদেরকে কোন অবকাশ দেওয়া হবে না। (৮৬) মুশরিকরা যখন ঐ সব বস্তুকে দেখবে, যেসবকে তারা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক সাব্যস্ত করেছিল, তখন বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, এরাই তারা যারা আমাদের শিরক-এর উপাদান, তোমাকে ছেড়ে আমরা যাদেরকে ডাকতাম। তখন ওরা তাদেরকে বলবে ঃ তোমরা মিথ্যাবাদী। (৮৭) সেদিন তারা আল্লাহ্‌র সামনে আত্মসমর্পণ করবে এবং তারা যে মিথ্যা অপবাদ দিত তা বিস্মৃত হবে। (৮৮) যারা কাফির হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, আমি তাদেরকে আযাবের পর আযাব বাড়িয়ে দেব। কারণ তারা অশান্তি সৃষ্টি করত। (৮৯) সেদিন প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে আমি একজন বর্ণনাকারী দাঁড় করাব তাদের বিপক্ষে তাদের মধ্য থেকেই এবং তাদের বিষয়ে আপনাকে সাক্ষীস্বরূপ আনয়ন করব। আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি যেটি এমন যে, তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়ত, রহমত এবং আত্মসমর্পণকারীদের জন্য সুসংবাদ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (সে দিনটি স্মরণযোগ্য) যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে এক-একজন সাক্ষী (যে সে উম্মতের পয়গম্বর হবেন) দাঁড় করাব (সে তাদের মন্দ কর্মের সাক্ষ্য দেবে) অতঃপর কাফিরদেরকে (ওযর-আপত্তি করার) অনুমতি দেওয়া হবে না কিংবা তাদেরকে আল্লাহ্‌কে রাযী করারও নির্দেশ দেওয়া হবে না। (অর্থাৎ তাদেরকে বলা হবে না যে, তোমরা তওবা অথবা কোন কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করে নাও। এর কারণ সুস্পষ্ট--পরকাল হচ্ছে প্রতিদান জগত, কর্মজগত নয়।) যখন জালিমরা (অর্থাৎ কাফিররা) আযাব প্রত্যক্ষ করবে (অর্থাৎ তাতে পতিত হবে), আযাব তখন তাদের শিথিল করা হবে না এবং তারা (তাতে) অবকাশপ্রাপ্ত হবে না (যেমন, কিছুদিন পরে জারি করা)। যখন মুশরিকরা তাদের অবলম্বনকৃত শরীকদের (আল্লাহ্ ব্যতীত তারা যাদের ইবাদত করত) দেখবে, তখন (অপরাধ স্বীকার করার ভঙ্গিতে) বলবে ঃ হে আমাদের পালন কর্তা, আমাদের অবলম্বনকৃত শরীক এরাই---আপনাকে ছেড়ে আমরা যাদের ইবাদত করতাম। অতঃপর তারা (শরীকরা

ভয় করবে যে, কোথাও না তাদের বিপদ এসে যায়, তাই) তাদের (প্রতি কথা ফিরিয়ে) বলবে যে, তোমরা মিথ্যাবাদী। (তাদের আসল উদ্দেশ্য এই, তোমাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। এভাবে তারা নিজেদের হিফাযত করতে চাইবে। তাদের এই উদ্দেশ্য সত্য হোক; যেমন আল্লাহ্র প্রিয়জন ফেরেশতা ও পয়গম্বরগণ একথা বললে, তা সত্য হবে

كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ—অথবা মিথ্যা হোক; যেমন স্বয়ং

শয়তানরা বললে মিথ্যা হবে, কিংবা সত্য না মিথ্যা বক্তারা তা জানেই না; যেমন মূর্তি, বৃক্ষ ইত্যাদি শরীক যদি একথা বলে) এবং মুশরিক ও কাফিররা সেদিন আল্লাহ্র সামনে আনুগত্যের কথাবার্তা বলতে থাকবে এবং দুনিয়াতে যেসব মিথ্যা অপবাদ রটনা করত (তখন) তা সব ভুলে যাবে (এবং তাদের মধ্যে) যারা (নিজেরাও) কুফুরী করত এবং (অপরকেও) আল্লাহ্র পথ (অর্থাৎ দীন) থেকে ফিরিয়ে রাখত, তাদের জন্য আমি এক শাস্তির উপর (যা কুফুরীর বিনিময়ে হবে) অন্য শাস্তি তাদের অনাচারের কারণে (অর্থাৎ আল্লাহ্র পথ থেকে ফিরিয়ে রাখার কারণে) বাড়িয়ে দেব। আর (সে দিনটিও স্মরণীয় ও ভয় করার যোগ্য) যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মতের এক একজন সাক্ষী তাদের মধ্য থেকে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাব। (এখানে উম্মতের নবীকে বোঝানো হয়েছে। 'তাদেরই মধ্য থেকে'---এটা বংশ ভিত্তিক এবং দেশ ভিত্তিক উভয় প্রকারেই হতে পারে।) এবং তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে সাক্ষী করে আনব। [সাক্ষ্যের এ সংবাদ থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়তের সংবাদ বোঝা যায়। এ নবুয়তের প্রমাণ এই যে,] আমি আপনার প্রতি কোরআন নাযিল করেছি, যা (রিসালত প্রমাণের যে ভিত্তি অলৌকিকত্ব, সে অলৌকিক হওয়া ছাড়া এসব গুণের আধার যে,) সব (দীনি) বিষয় (প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সর্বসাধারণের জন্য) বর্ণনাকারী এবং (বিশেষভাবে) মুসলমানদের জন্য প্রকৃষ্ট হিদায়ত, অফুরন্ত রহমত এবং (ঈমানের কারণে) সুসংবাদদাতা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ—এতে কোরআনকে প্রত্যেক

বস্তুর বর্ণনাকারী বলা হয়েছে। 'প্রত্যেক বস্তু' বলে প্রধানত দীনের যাবতীয় বিষয় বোঝানো হয়েছে। কেননা, ওহী ও নবুয়তের লক্ষ্য এগুলোর সাথেই সম্পৃক্ত। তাই মানুষের আয়াসসাধ্য অন্যান্য বিজ্ঞান ও উদ্ভূত দৈনন্দিন সমস্যাদির তৈরী সমাধান কোরআন পাকে অনুসন্ধান করা ভুল। প্রসঙ্গত এসব সমস্যাদির সমাধানের ব্যাপারে যেসব ইঙ্গিত রয়েছে, মানবীয় মেধার সংযোগে সেসব থেকেই সমাধান খুঁজে বের করা সম্ভব। এখন প্রশ্ন থাকে যে, কোরআন পাকে অনেক দীনি খুঁটিনাটি বিষয়ও সবিস্তারে বর্ণিত হয়নি। এমতাবস্থায় কোরআনকে تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ---বলা যথার্থ হবে কিরূপ ?

এর উত্তর এই যে, কোরআন পাকে সব বিষয়েরই মূলনীতি বিদ্যমান রয়েছে। সেসব মূলনীতির আলোকেই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাদীস মাস'আলা বর্ণনা করে। কিছু কিছু বিবরণ ইজমা ও কিয়াসের আওতায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস থেকে যেসব মাস'আলা নির্গত হয়েছে, সেগুলোও পরোক্ষভাবে কোরআনেরই বর্ণিত মাস'আলা।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

(৯০) আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি লজ্জাহীনতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন---যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা (কোরআনে) ভারসাম্য, অনুগ্রহ এবং নিকটাত্মীয়দেরকে দান-খয়রাত করার আদেশ দেন এবং প্রকাশ্য বা যে কোন মন্দ কাজ এবং (কারও প্রতি) অত্যাচার (ও নিপীড়ন) করতে নিষেধ করেন। (উল্লিখিত আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ কাজসমূহের মধ্যে যাবতীয় সৎকর্ম ও কুকর্ম এসে গেছে। বিষয়বস্তুর এ ব্যাপকতার কারণে কোরআন যে প্রত্যেক বস্তুর বর্ণনাকারী তা বলার অপেক্ষা রাখে না এবং) আল্লাহ্ তোমাদেরকে (উল্লিখিত বিষয়বস্তুর) এজন্য উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর (এবং সে মত কাজ কর। কেননা, 'হিদায়তকারী', 'রহমত'ও সুসংবাদদাতা হওয়া এরই উপর নির্ভরশীল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতটি কোরআন পাকের একটি ব্যাপক অর্থবোধক আয়াত। এর কয়েকটি শব্দের মধ্যেই ইসলামী শিক্ষার যাবতীয় বিষয় লুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের আমল থেকে আজ পর্যন্ত জুম'আ ও দুই ঈদের খুতবার শেষ দিকে এ আয়াতটি পাঠ করা হয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন ঃ সূরা নাহ্‌লের إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ আয়াতটি হচ্ছে কোরআন পাকের ব্যাপকতর অর্থবোধক আয়াত।---(ইবনে কাসীর)

হযরত আকসাম ইবনে সায়ফী (রা) এ আয়াতের কারণেই মুসলমান হয়েছিলেন। ইমাম ইবনে কাসীর হাফিযে হাদীস আবূ ইয়ালার গ্রন্থ মারেফাতুস্‌সাহাবা থেকে সনদসহ এ ঘটনা বর্ণনা করেন যে, আকসাম ইবনে সায়ফী স্বীয় গোত্রের সর্দার ছিলেন। রসূলুল্লাহ্

(সা)-এর নবুয়ত দাবী ও ইসলাম প্রচারের সংবাদ পেয়ে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আগমন করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু গোত্রের লোকেরা বলল ঃ আপনি সবার প্রধান। আপনার স্বয়ং যাওয়া সমীচীন নয়। আকসাম বললেন ঃ তবে গোত্র থেকে দু'ব্যক্তিকে মনোনীত কর। তারা সেখানে যাবে এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমাকে জানাবে। মনোনীত দু'ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করল ঃ আমরা আকসাম ইবনে সায়ফীর পক্ষ থেকে দু'টি বিষয় জানতে এসেছি। আকসামের প্রশ্ন দু'টি এই ঃ

مَنْ اَنْتَ وَمَا اَنْتَ আপনি কে এবং কি ?

রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমি আবদুল্লাহ্র পুত্র মুহাম্মদ। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রসূল। এরপর তিনি সূরা নাহ্লের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ ---উভয় দূত অনুরোধ করল ঃ এ বাক্যগুলো আমাদেরকে আবার শোনানো হোক। রসূলুল্লাহ্ (সা) আয়াতটি একাধিকবার তিলাওয়াত করেন। ফলে শেষ পর্যন্ত আয়াতটি তাদের মুখস্থ হয়ে যায়।

দূতদ্বয় আকসাম ইবনে সায়ফীর কাছে ফিরে এসে উল্লিখিত আয়াত শুনিয়ে দিল। আয়াতটি শুনেই আকসাম বলল ঃ এতে বোঝা যায় যে, তিনি উত্তম চরিত্রের আদেশ দেন এবং মন্দ ও অপকৃষ্ট চরিত্র অবলম্বন করতে নিষেধ করেন। তোমরা সবাই তাঁর ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, যাতে তোমরা অন্যদের অগ্রে থাক এবং পেছনে অনুসারী হয়ে না থাক।--- (ইবনে কাসীর)

এমনিভাবে হযরত উসমান ইবনে মযউন (রা) বলেন ঃ শুরুতে আমি লোকমুখে শুনে ঝোঁকের মাথায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম, আমার অন্তরে ইসলাম বদ্ধমূল ছিল না। একদিন আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত ছিলাম, হঠাৎ তাঁর উপর ওহী অবতরণের লক্ষণ প্রকাশ পেল। কতিপয় বিচিত্র অবস্থার পর তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র দূত এসেছিল এবং এই আয়াত আমার প্রতি নাযিল হয়েছে। হযরত উসমান ইবনে মযউন বলেন ঃ এই ঘটনা দেখে এবং আয়াত শুনে আমার অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল ও অটল হয়ে গেল এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মহব্বত আমার মনে আসন পেতে বসল। ইবনে কাসীর এ ঘটনা বর্ণনা করে এর সনদকে হাসান ও নির্ভুল বলেছেন।

রসূলুল্লাহ্ (সা) এ আয়াত ওলীদ ইবনে মুগীরার সামনে তিলাওয়াত করলে সে-ও প্রভাবান্বিত হয় এবং কুরায়শদের সামনে ভাষণ দেয় যে ঃ

وَاللّٰهِ اِنَّ لَهٗ لَحَلَاوَةً وَاِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً وَاِنَّ اَصْلَهٗ لَمُوْرِقٌ وَاِنَّ فَرْعَهٗ لَمُثْمِرٌ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ بَشَرٍ

আল্লাহ্‌র কসম, এতে একটি বিশেষ মাধুর্য রয়েছে। এর মধ্যে একটি বিশেষ রওনক ও ঔজ্জ্বল্য রয়েছে। এর মূল থেকে শাখা ও পাতা গজাবে এবং শাখা ফলন্ত হবে। এটা কখনও কোন মানুষের বাক্য হতে পারে না।

তিনটি বিষয়ের আদেশ ও তিনটি বিষয়ের নিষেধাজ্ঞা ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তিনটি বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন ঃ সুবিচার, অনুগ্রহ ও আত্মীয়দের প্রতি অনুগ্রহ। পক্ষান্তরে তিন প্রকার কাজ করতে নিষেধ করেছেন ঃ নির্লজ্জ কাজ, প্রত্যেক মন্দ কাজ এবং জুলুম ও উৎপীড়ন। আয়াতে ব্যবহৃত ছয়টি শব্দের পারিভাষিক অর্থ ও সংজ্ঞার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ঃ

عدل ---শব্দের আসল ও আভিধানিক অর্থ সমান করা। এর সাথে সম্বন্ধ রেখেই বিচারকদের জনগণের বিরোধ সংক্রান্ত মোকদ্দমায় সুবিচারমূলক ফয়সালা করাকে عدل বলা হয়। اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ আয়াতে এ অর্থই বিধৃত হয়েছে। এ অর্থের দিক দিয়েই স্বল্পতা ও বাহুল্যের মাঝামাঝি সমতাকেও عدل বলা হয়। কোন কোন তফসীরবিদ এ অর্থের সাথে সম্বন্ধ রেখেই আলোচ্য আয়াতে বাইরে ও ভিতরে সমান হওয়া দ্বারা عدل শব্দের তফসীর করেছেন। অর্থাৎ عدل এমন উক্তি অথবা কর্ম, যা মানুষের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে প্রকাশ পায় এবং অন্তরেও তদ্রূপ বিশ্বাস থাকে। বাস্তব সত্য এই যে, এখানে عدل শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এতে উপরোক্ত সব অর্থই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তফসীরবিদদের কাছ থেকে বর্ণিত এসব অর্থের মধ্যে কোন পরস্পর বিরোধিতা নেই।

ইবনে আরাবী বলেন ঃ 'আদল' শব্দের আসল অর্থ সমান করা। এরপর বিভিন্ন সম্পর্কের কারণে এর অর্থ বিভিন্ন হয়ে যায়। উদাহরণত প্রথম আদল হচ্ছে মানুষ ও আল্লাহ্‌র মধ্যে আদল করা। এর অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার হককে নিজের ভোগ-বিলাসের উপর এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে নিজের কামনা-বাসনার উপর অগ্রাধিকার দেওয়া, আল্লাহ্‌র বিধানাবলী পালন করা এবং নিষিদ্ধ ও হারাম বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা।

দ্বিতীয় আদল হচ্ছে মানুষের নিজের সাথে আদল করা। তা এই যে, দৈহিক ও আত্মিক ধ্বংসের কারণাদি থেকে নিজেকে বাঁচানো, নিজের এমন কামনা পূর্ণ না করা যা পরিণামে ক্ষতিকর হয় এবং সবর ও অল্পে তুষ্টি অবলম্বন করা, নিজের উপর অহেতুক বেশি বোঝা না চাপানো।

তৃতীয় আদল হচ্ছে নিজের এবং সমগ্র সৃষ্টজীবের সাথে শুভেচ্ছা ও সহানুভূতিমূলক ব্যবহার করা, ছোটবড় ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা না করা, সবার জন্য নিজের মনের কাছে সুবিচার দাবী করা এবং কোন মানুষকে কথা অথবা কার্য দ্বারা প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে কোনরূপ কষ্ট না দেওয়া।

এমনিভাবে বিচারে রায় দেওয়ার সময় পক্ষপাতিত্ব না করে সত্যের অনুকূলে রায় দেওয়া এক প্রকার আদল এবং প্রত্যেক কাজে স্বল্পতা ও বাহুল্যের পথ বর্জন করে মধ্যবর্তিতা

অবলম্বন করাও এক প্রকার আদল। আবূ আবদুল্লাহ্ রাযী এ অর্থ গ্রহণ করেই বলেছেন যে, আদল শব্দের মধ্যে বিশ্বাসের সমতা, কার্যের সমতা, চরিত্রের সমতা---সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।---(বাহ্‌রে মুহীত)

ইমাম কুরতুবী আদলের অর্থ প্রসঙ্গে উপরোক্ত বিবরণ উল্লেখ করে বলেছেন যে, এ বিবরণ খুবই চমৎকার। এ থেকে আরও জানা গেল যে, আয়াতের আদল শব্দটিই যাবতীয় উত্তম কর্ম ও চরিত্র অনুসরণ এবং মন্দ কর্ম ও চরিত্র থেকে বেঁচে থাকার অর্থে পরিব্যাপ্ত রয়েছে।

اِحْسَان—এর আসল আভিধানিক অর্থ সুন্দর করা। তা দু'প্রকার। এক. কর্ম, চরিত্র, ও অভ্যাসকে সুন্দর ও ভাল করা। দুই. কোন ব্যক্তির সাথে ভাল ব্যবহার ও উত্তম আচরণ করা। দ্বিতীয় অর্থের জন্য আরবী ভাষায় احسان শব্দের সাথে الى অব্যয় ব্যবহৃত হয়; যেমন এক আয়াতে اَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ বলা হয়েছে।

ইমাম কুরতুবী বলেনঃ আলোচ্য আয়াতে এ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই উপরোক্ত উভয় প্রকার অর্থই এতে শামিল রয়েছে। প্রথম প্রকার ইহ্‌সান অর্থাৎ কোন কাজকে সুন্দর করা---এটাও ব্যাপক; অর্থাৎ ইবাদত, কর্ম, চরিত্র, পারস্পরিক লেনদেন ইত্যাদিকে সুন্দর করা।

প্রসিদ্ধ 'হাদীসে-জিবরায়ীলে' স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) ইহ্‌সানের যে অর্থ বর্ণনা করেছেন, তা হচ্ছে ইবাদতের ইহ্‌সান। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্‌র ইবাদত এভাবে করা দরকার, যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি আল্লাহ্‌র উপস্থিতির এমন স্তর অর্জন করতে না পার, তবে এতটুকু বিশ্বাস তো প্রত্যেক ইবাদতকারীরই থাকা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার কাজ দেখছেন। কেননা, আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও দৃষ্টির বাইরে কোন কিছু থাকতে পারে না---এটা ইসলামী বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় নির্দেশ ইহ্‌সান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এতে ইবাদতের ইহ্‌সান এবং যাবতীয় কর্ম, চরিত্র ও অভ্যাসের ইহ্‌সান অর্থাৎ এগুলোকে প্রাথিত উপায়ে বিশুদ্ধ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর করা বোঝানো হয়েছে। এছাড়া মুসলমান, কাফির মানুষ ও জন্তু নির্বিশেষে সকলের সাথে উত্তম ব্যবহার করার বিষয়টিও এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম কুরতুবী বলেনঃ যে ব্যক্তির গৃহে তার বিড়াল খোরাক ও অন্যান্য দরকারী বস্তু না পায় এবং যার পিঞ্জরায় আবদ্ধ পাখীর পুরোপুরি দেখাশোনা করা না হয়, সে যত ইবাদতই করুক, ইহ্‌সানকারী গণ্য হবে না।

আয়াতে প্রথম আদল ও পরে ইহ্‌সানের আদেশ প্রদান করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ আদল হচ্ছে অন্যের অধিকার পুরোপুরি দেওয়া এবং নিজের

অধিকার পুরোপুরি নেওয়া---কমও নয়, বেশিও নয়। তোমাকে কেউ কষ্ট দিলে তুমি তাকে ততটুকুই কষ্ট দাও, যতটুকু সে দিয়েছে। পক্ষান্তরে ইহ্‌সান হচ্ছে অপরকে তার প্রাপ্য অধিকারের চাইতে বেশি দেওয়া এবং নিজের অধিকার নেয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি না করা এবং কিছু কম হলেও কবুল করে নেওয়া। এমনিভাবে কেউ তোমাকে হাতে কিংবা মুখে কষ্ট দিলে তুমি তার কাছ থেকে সমান প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে ক্ষমা করে দাও। বরং সৎ কাজের মাধ্যমে মন্দকাজের প্রতিদান দাও। এমনিভাবে আদলের আদেশ হল ফরয ও ওয়াজিবের স্তরে এবং ইহ্‌সানের আদেশ হল কর্মের স্তরে।

إِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ----এ হচ্ছে তৃতীয় আদেশ إيتاء শব্দের অর্থ কোন কিছু দেওয়া এবং قربى শব্দের অর্থ আত্মীয়তা ذى القربى শব্দের অর্থ আত্মীয়-স্বজন। অতএব إِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ -এর অর্থ হল আত্মীয়-স্বজনকে কিছু দেওয়া। কি বস্তু দেওয়া, এখানে তা উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু অন্য এক আয়াতে তা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ -—অর্থাৎ আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দান কর। বাহ্যত আলোচ্য আয়াতেও তাই বোঝানো হয়েছে ; অর্থাৎ আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দিতে হবে। অর্থ দিয়ে আর্থিক সেবা করা, দৈহিক সেবা করা, অসুস্থ হলে দেখাশোনা করা, মৌখিক সান্ত্বনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করা ইত্যাদি সবই উপরোক্ত প্রাপ্যের অন্তর্ভুক্ত। ইহ্‌সান শব্দের মধ্যে আত্মীয়ের প্রাপ্য দেওয়ার কথাও অন্তর্ভুক্ত ছিল ; কিন্তু অধিক গুরুত্ব বোঝাবার জন্য একে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ তিনটি ছিল ইতিবাচক নির্দেশ ঃ অতঃপর তিনটি নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হচ্ছে। وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ----অর্থাৎ আল্লাহ্‌ অশ্লীলতা, অসৎ কর্ম ও সীমালংঘন করতে নিষেধ করেছেন। প্রকাশ্য মন্দকর্ম অথবা কথাকে অশ্লীলতা বলা হয়, যাকে প্রত্যেকেই মন্দ মনে করে। 'মুনকার' তথা অসৎ কর্ম এমন কথা অথবা কাজ যা হারাম ও অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে শরীয়ত বিশেষজ্ঞগণ একমত। তাই ইজতেহাদী মতবিরোধের কারণে কোন পক্ষকে 'মুনকার' বলা যায় না। প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য, কর্মগত ও চরিত্রগত যাবতীয় গোনাহ্‌ মুনকারের অন্তর্ভুক্ত। بغى শব্দের আসল অর্থ সীমালংঘন করা। এখানে জুলুম ও উৎপীড়ন বোঝানো হয়েছে। মুনকার শব্দের যে অর্থ বর্ণিত হয়েছে, তাতে فحشاء- ও بغى- -ও অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু চূড়ান্ত মন্দ হওয়ার কারণে فحشاء -কে পৃথক এবং অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। بغى--কে পৃথক উল্লেখ করার কারণ এই যে, এর প্রভাব অপরাপর লোক পর্যন্ত সংক্রমিত হয়।

মাঝে মাঝে এই সীমালংঘন পারস্পরিক যুদ্ধ পর্যন্ত অথবা আরও অধিক সারা বিশ্বেও অশান্তি সৃষ্টির পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ জুলুম ব্যতীত এমন কোন গোনাহ্ নেই, যার বিনিময় ও শাস্তি দ্রুত দেওয়া হবে। এতে বোঝা যায় যে, জুলুমের কারণে পরকালীন কঠোর শাস্তি তো হবেই; এর আগে দুনিয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা জালিমকে শাস্তি দেন; যদিও সে বুঝতে পারে না যে, এটা অমুক জুলুমের শাস্তি। আল্লাহ্ তা'আলা মজলুমের সাহায্য করার অঙ্গীকার করেছেন।

আলোচ্য আয়াত যে ছয়টি ইতিবাচক ও নেতিবাচক নির্দেশ দান করেছে, চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এগুলো মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সাফল্যের অমোঘ প্রতিকার। رزقنا الله تعالى اتباعه

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾ وَلَا
تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا ۚ تَتَّخِذُونَ
أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ
إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن
يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾
وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا
وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلَكُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ ﴿٩٤﴾ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ
اللَّهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

(৯১) আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার করার পর সে অঙ্গীকার পূর্ণ কর এবং পাকাপাকি কসম করার পর তা ভঙ্গ করো না, অথচ তোমরা আল্লাহ্‌কে জামিন করেছ। তোমরা যা কর আল্লাহ্‌ তা জানেন। (৯২) তোমরা ঐ মহিলার মত হয়ো না, যে পরিশ্রমের পর পাকান সূতা খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়ে ফেলে, তোমরা নিজেদের কসমসমূহকে পারস্পরিক প্রবঞ্চনার বাহানারূপে গ্রহণ কর এজন্যে যে, অন্য দল অপেক্ষা একদল অধিক ক্ষমতাবান হয়ে যায়। এতদ্বারা তো আল্লাহ্‌ শুধু তোমাদের পরখ করেন। আল্লাহ্‌ অবশ্যই কিয়ামতের দিন প্রকাশ করে দেবেন, যে বিষয়ে তোমরা কলহ করতে। (৯৩) আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে এক জাতি করে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করেন। তোমরা যা কর সে বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। (৯৪) তোমরা স্বীয় কসমসমূহকে পারস্পরিক কলহদ্বন্দ্বের বাহানা করো না। তা হলে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পা ফসকে যাবে এবং তোমরা শাস্তির স্বাদ আস্বাদ করবে এ কারণে যে, তোমরা আমার পথে বাধাদান করেছ এবং তোমাদের কঠোর শাস্তি হবে। (৯৫) তোমরা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তা উত্তম তোমাদের জন্য, যদি তোমরা জ্ঞানী হও। (৯৬) তোমাদের কাছে যা আছে নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে, কখনও তা শেষ হবে না। যারা সবর করে, আমি তাদেরকে প্রাপ্য প্রতিদান দেব তাদের উত্তম কর্মের প্রতিদানস্বরূপ যা তারা করত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(অঙ্গীকার পূর্ণ করার নির্দেশ এবং অঙ্গীকার ভঙ্গের নিন্দা ঃ) তোমরা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ যে অঙ্গীকার পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, তাকে) পূর্ণ কর। (এর ফলে শরীয়তবিরোধী অঙ্গীকার এর আওতা বহির্ভূত হয়ে গেছে। অবশিষ্ট যাবতীয় অঙ্গীকার---আল্লাহ্‌র হক সম্পর্কিত হোক অথবা বান্দার হক সম্পর্কিত ---এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।) যখন তোমরা তা (বিশেষভাবে অথবা সাধারণভাবে) নিজ দায়িত্বে করে নাও (বিশেষভাবে এই যে, স্পষ্টকৃত কোন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ কর এবং সাধারণ-ভাবে এই যে, ঈমান আনার পর যাবতীয় ফরয বিধানের দায়িত্ব প্রসঙ্গক্রমে নেওয়া হয়ে গেছে) এবং (বিশেষত যেসব অঙ্গীকারে কসমও খাওয়া হয়, সেগুলো অধিকতর পালনীয়। অতএব এসবের মধ্যে) কসমসমূহকে পাকা করার পর (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে কসম খাওয়ার পর তা) ভঙ্গ করো না এবং তোমরা (এসব কসমের কারণে অঙ্গীকারসমূহে) আল্লাহ্‌কে সাক্ষীও করেছ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا এবং بَعْدَ تَوْكِيدِهَا

---এগুলো বাস্তব শর্ত ; অঙ্গীকার পূরণে হুঁশিয়ার করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে।) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ জানেন তোমরা যা কর (অঙ্গীকার পূর্ণ কর কিংবা ভঙ্গ কর---তদনুযায়ী তোমাদের প্রতিদান দেবেন।) তোমরা (অঙ্গীকার ভঙ্গ করে) ঐ